দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ২২ সংখ্যা ❖ ২ এপ্রিল ২০২৬



➲ এই সংখ্যায় থাকছে

বিশেষ নিবন্ধ

- মনরেগা, আরটিআই, খাদ্য সুরক্ষা বনাম সিএএ, ওয়াকফ, ৩৭০: মনমোহন সিংহ বনাম মোদীর আইন প্রণয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ — সঞ্জয় ঝা — ৩
- পশ্চিমবঙ্গের গত পনেরো বছর — অশোক সরকার — ৫
- রূপান্তরকামীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে আইন আনলো কেন্দ্র — মিলন দত্ত — ৭
- কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতির কারণে বিপন্ন আলুচাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী — শান্তি পাহাড়ী — ৯, ১১

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

- অপারেশন এপিক ফিউরি ও অপারেশন রোরিং লায়ন — অমিতাভ সিংহ — ১৩
- পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না — সৌর বসু — ১৩
- একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি চেয়ে মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব — শুভাশিস মজুমদার — ১৪

বাংলাদেশ

- ৭ই মার্চের ঢাকা ও শেখ মুজিব — শুভ বসু — ১৬
- ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক সমাবেশ — ১৭

দেশের খবর

- লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি ও ভোটাধিকার হরণ — সুকুমার মিত্র — ১৮
- নতুন পরিস্থিতিতে অসমের বিধানসভা নির্বাচন এবং বিরোধী ঐক্য — কমলেশ গুপ্ত — ১৯
- এপস্টিন কান্ডে ভারতেও বিতর্কের ঝড় — শুভাশিস মজুমদার — ২১
- মনরেগা বাঁচাও যাত্রা — জিতেন নন্দী — ২২

ধারাবাহিক

- কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ২৩
- জরুরী অবস্থার পরবর্তী পরিস্থিতি — সুশান্ত দাশগুপ্ত — ২৫

পুস্তক পর্যালোচনা

- মহাত্মা গাঁধী (৩ খন্ড) — ২৭
  লেখক : বিপুল রঞ্জন সরকার
- বন্ধুতার পাতা — সংকলক শুভেন্দু দাশগুপ্ত (পত্রিকার শেষ চারপাতা)

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশ : কোটি'র ছায়াময় খেলা

বিজেপির 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ , রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ' সংক্রান্ত অভিযোগগুলি রাজনৈতিকভাবে সরব হলেও, এই বিষয়ে আজ পর্যন্ত ওই দল কোনও সংখ্যাগত বিশ্লেষণ দিতে পারেনি।এবং তা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাসের সম্পূর্ণ অংশ পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, তবে তা ২০ থেকে ৩০ লক্ষের বেশি নয়। আর হিন্দুরা তো বিজেপির মতে শরণার্থী। অথচ, ২০০১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ২৫ বছরে রাজ্যের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ২.৫৪ কোটি, শতাংশের হিসেবে ৩১.৭১ শতাংশ। অর্থাৎ বছরে ১.২৬ শতাংশ।

একদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বলছেন, 'কোটি ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী !' রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন ১ কোটি, বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর বলছেন ১ কোটি ২০ লক্ষ।

অন্যদিকে, সংসদের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেই স্বীকার করছেন, ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে মোটে ১,৮২২ জন। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৪৫৫ জন। তাঁর এই হিসাবে কোটি পূরণ করতে লাগবে আরও ২২,০০০ বছর। কিন্তু ভোটের মরশুমে কে আর ক্যালকুলেটর নিয়ে মঞ্চে ওঠে ?

২০১৮ সাল থেকে সরকার তাই দেশভিত্তিক প্রত্যর্পণের পরিসংখ্যান প্রকাশই বন্ধ করে দিয়েছে। যেন সংখ্যাটা জাতীয় গোপনীয়তার আওতায় চলে গেছে। তাই এখন আর কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, 'ভাই, কোটিটা কোথায় ?' উত্তর একটাই; মঞ্চের আলোয়, লাউডস্পিকারের গর্জনে, আর হাততালির ঝড়ে।

বাস্তবে, অনুপ্রবেশকারীরা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিজেপি'র প্রচার , তারা নাকি মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহার , উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ,আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি UN World Population Prospects অনুযায়ী, ১৯৮১-১৯৯১ সালের মধ্যে বামফ্রন্টের জমানায় বার্ষিক অনুপ্রবেশ ছিল মাত্র ৯১ হাজার যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্র ০.৯ শতাংশের সঙ্গে মেলে। ওই সময় বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল।, অনুপ্রবেশের অভিযোগটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যের দ্বারা সহজেই খণ্ডনযোগ্য।

মূল দাবি ছিল, ২০০১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৩১.৭১ শতাংশ হলেও ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৭ শতাংশ। এই ৩৫ শতাংশের ব্যবধান আলোচনার বিষয়, কিন্তু এর প্রধান কারণ অনুপ্রবেশ নয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।আর এই ধরনের উচ্চ ভোটার বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা নয়, এটি জাতীয় প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮১ সালে কেরালার জনসংখ্যা ছিল ২.৫৪ কোটি, যা ২০২৫ সালের অনুমান (২০২১ সালে দেশে জনগণনা হয়নি) অনুসারে বেড়ে ৩.৬১ কোটিতে পৌঁছেছে। একই সময়ে ভোটার সংখ্যা ১৯৮২-এর ১.১৫ কোটি থেকে ২০২৫-এ ২.৭৮ কোটিতে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ ১৪১ শতাংশ বৃদ্ধি। এই পার্থক্য প্রশাসনিক কার্যক্ষমতা ও যুবকদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের ফল, অনুপ্রবেশের নয়। ছত্তিশগড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪৪.২৩ শতাংশ হলেও ভোটার বৃদ্ধির হার ৬৯.২৩ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশের পার্থক্য। একইভাবে, হরিয়ানায় এই পার্থক্য প্রায় ২৪ শতাংশ এবং উত্তরাখণ্ডে ১৯ শতাংশ। এই রাজ্যগুলিতে ভোটার বৃদ্ধির হার জনসংখ্যার চেয়ে ২০-২৫ শতাংশ বেশি হওয়া প্রমাণ করে যে, এই ব্যবধানটি অস্বাভাবিক নয়, বরং প্রশাসনিক সক্ষমতা, যুবকদের নথিভুক্তকরণ এবং পরিযান (মাইগ্রেশন)-এর স্বাভাবিক প্রভাবের ফল। বিপরীতে, উত্তরপ্রদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে ভোটার বৃদ্ধির হার বরং কম, যা গ্রামীণ এলাকায় নথিভুক্তকরণের অভাব নির্দেশ করে। পাশাপাশি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে উত্তর প্রদেশ সরকার আন্তরিক হলে ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসে সম্ভাব্য প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করার বিষয়ে সচেতন করতে পারতো। এই দিবসের মূল স্লোগানগুলোর মধ্যে একটি হলো-- "Proud to be a voter : Ready to vote".

পশ্চিমবঙ্গে বিহার , উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড় থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের নানা সরকারি সুযোগ, সুবিধা গ্রহণের জন্য এই রাজ্যের ভোটার হওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। এই অংশের ভোটাররা জনগণনা না হওয়ার ফলে , তার প্রতিফলন ২০১১ সালের পর গত ১৪ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর কী তা বোঝা মুশকিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও ভোটার বৃদ্ধির হারের তারতম্যকে বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা প্রবল। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভোটার তালিকা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তা মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাস্তব তথ্য বলছে, রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত, অনুপ্রবেশের অবদান নগন্য, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভোটার তালিকার অস্বাভাবিকতা বলে যে প্রচার তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তার সপক্ষে জোরালো কোনও পরিসংখ্যান নেই। যা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস (Demography)-এর তথাকথিত অস্বাভাবিকতাকে বা তথাকথিত বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের 'শাহ-অধিকারী-ঠাকুর (SAT)'-দের ছেদো যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন বিজেপি নেতারা। না পারলে কি হবে গোয়েবেলসিয় তত্ত্বে বারবার মিথ্যা বলে যাও এক সময় তা সত্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ মানুষকে বোকা বানানোর চিরায়ত প্রচারিত এই তত্ত্ব মেনেই বিজেপি সেই পথেই হেঁটে চলেছে। অযোধ্যায় ১৯৪৮-এ ঢোকানো রামলালা প্রচার ও সর্বোপরি অন্ধ বিশ্বাসের উপর 'জীবন্ত রামচন্দ্র' তো চোখের সামনেই হয়ে উঠেছে। তাহলে রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী প্রচার রাজ্য তথা দেশবাসীকে গেলাতে অসুবিধা কোথায় ?

অথচ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের CEO মনোজ আগরওয়াল কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন রাজ্যে কত বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ? তিনি বলেন আমরা জানিনা , স্বরাষ্ট্র বিভাগ জানে। আর অমিত শাহকে ২৮ মার্চ প্রশ্ন করা হল কত অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করা গিয়েছে ? উত্তরে তিনি বললেন ' আমি কিছু জানিনা। নির্বাচন কমিশন জানে।ওরাই ঘোষণা করবে। আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই।' অথচ ইনিই বলে চলেছেন কোটি কোটি অনুপ্রবেশকারী এবং তিনি তাদের মেরে দেশ থেকে বের করে দেবেন।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সংসদে বলছে, 'তথ্য দিন, পরিসংখ্যান দিন।' কিন্তু তথ্য তো গোপনীয়। পরিসংখ্যান তো রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য। সংসদে প্রকৃত তথ্য দিলে আর কেউ 'কোটি কোটি' শব্দটা কখনও মুখে আনবেন না। কিন্তু তা হবে না। কারণ তথ্য এলে ভয় দেখানোর খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ভয় ছাড়া ভোট পাওয়া যায় না। তাই মিথ্যা প্রচার চলুক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে অ্যারিস্টটলের উক্তিটি— 'যে ব্যক্তি সত্যকে ভালোবাসে, সে মিথ্যার ছায়া থেকে মুক্ত হয়। কারণ সত্যই গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি, আর মিথ্যা তার বিষ।'

বিশেষ নিবন্ধ

মনরেগা, আরটিআই, খাদ্য সুরক্ষা বনাম সিএএ, ওয়াকফ, ৩৭০: মনমোহন সিংহ বনাম নরেন্দ্র মোদীর আইন প্রণয়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সঞ্জয় ঝা

নির্বাচনী রাজনীতির প্রচার-প্রচারণা ও উচ্চকণ্ঠ স্লোগানের আড়ালে, একটি সরকারের প্রকৃত চরিত্র বিচার করার সবচেয়ে নিরপেক্ষ মাপকাঠি হচ্ছে তার আইন প্রণয়নের ধরন। এটি একটি আয়না যা মিথ্যে বলে না। যদি মনমোহন সিং-এর সরকারকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি আইন (MGNREGA), তথ্যের অধিকার (RTI) এবং খাদ্য সুরক্ষা আইন (FSA)-এর মতো প্রগতিশীল আইনগুলোর জন্য মনে রাখা হয়, তবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সর্বাধিক আলোচিত উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ, কৃষি আইন এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিল।

ভারতের রাজনীতির অসংখ্য সংঘর্ষের মধ্যে, জনগণের অধিকার এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপেক্ষিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মনমোহন সরকারের আমলে সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ছিল 'অধিকারভিত্তিক' আইন। এটি ছিল একটি অনন্য ধারণা, যেখানে আইনি নিশ্চয়তার মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়ন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর মোদী সরকারের অধীনে রাজনৈতিক কল্পনায় এক মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায় ; যা আইন, প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখন রাজনৈতিক বিরোধী ও বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শই সন্দেহ প্রকাশ করেন;এই আইন কারও না কারও অধিকার হরণ করতে যাচ্ছে। খসড়া আইনের গুণমানের চেয়ে সরকারের উদ্দেশ্যই যেন বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠছে।

মোদী সরকারের প্রথম মেয়াদের শুরুতেই একটি বড় ধাক্কা আসে, যখন ঐতিহাসিক ভূমি অধিগ্রহণ আইনকে দুর্বল করার জন্য একটি অর্ডিন্যান্স আনা হয়। কংগ্রেস ও কৃষকরা অভিযোগ করেন, মোদী সরকার শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গরিবদের ক্ষতির দিকে এগোচ্ছে। এটি একটি বড় রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে পিছু হটতে হয়। এই ঘটনার সঙ্গে একাধিক বিমানবন্দর একটি বেসরকারি সংস্থাকে বরাদ্দ দেওয়ার নিয়ম পরিবর্তনের মতো সিদ্ধান্তও যুক্ত হয়, যা স্পষ্ট করে দেয় যে মোদী সরকার কর্পোরেট স্বার্থর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। একের পর এক সিদ্ধান্তের পেছনের স্তরগুলো উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ তোলে যে, এই কর্পোরেটপ্রীতি ধীরে ধীরে প্রকৃত ক্রোনি ক্যাপিটালিজমে রূপ নিচ্ছে।

তবে, যা রাজনৈতিক আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো ক্রমাগত এক সুস্পষ্ট আদর্শগত এজেন্ডা বাস্তবায়নের ইচ্ছার ইঙ্গিত। সমাজের বিভিন্ন অংশ;ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও মুসলমানরা;অনুভব করেছে যে, একটি রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তাদের অধিকার পদদলিত হচ্ছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা শিক্ষা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার ইঙ্গিত দেয়, আর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) মুসলিম ও ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক ভয় সৃষ্টি করে, যার ফলে দেশজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে নজিরবিহীন প্রতিবাদ আন্দোলন চলে।

এরপর শুরু হয় ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন, যা প্রায় এক বছর ধরে চলে। লক্ষ লক্ষ কৃষক রাজধানী দিল্লির বাইরের রাস্তায় তীব্র গরম ও ভারী বর্ষণের মধ্যেও অনড় অবস্থানে বসে প্রতিবাদ জানান। এই আন্দোলনের সময় ৭০০-রও বেশি কৃষকের মৃত্যু ঘটে, অথচ সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতারা যে তিনটি কৃষি আইনকে ঘিরে কর্পোরেটদের কৃষিক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর প্রশংসা করতে থাকেন। এক বছরের মাথায় প্রধানমন্ত্রী যদিও অবশেষে আইন তিনটি প্রত্যাহার করে নেন, তবুও দেশ বুঝে যায়;একটি আইন যেমন আনন্দের স্রোত বইয়ে দিতে পারে, তেমনি ধ্বংসের ছায়াও বিস্তার করতে পারে।

মনমোহন সিং দেখিয়েছিলেন কীভাবে MGNREGA সারা গ্রামীণ ভারতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করেছিল, আর মোদী দেখালেন কীভাবে সিএএ ও কৃষি আইনগুলো সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে। মোদীর সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদক্ষেপ ছিল নোটবন্দি;যা আরও ভয়াবহ পরিণতি বয়ে এনেছে। এটি এক নজিরবিহীন সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, যার ফলাফল ছিল ব্যাপক হারে চাকরি হারানো, লাভজনক শিল্পের বন্ধ হয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক মন্দা ও হৃদয়বিদারক মানবিক সংকট। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আর কোনো নীতিই এমন গভীর ক্ষত তৈরি করেনি, যেমনটা নোটবন্দি করেছিল মানুষের জীবন ও দেশের অর্থনীতিতে।

এরপর আসে কোভিড মহামারী এবং তার পরপরই দায়িত্বজ্ঞানহীন লকডাউন, যা এক অভূতপূর্ব দুর্দশা, মৃত্যু ও

ধ্বংসযজ্ঞের ঢেউ সৃষ্টি করে। মনমোহন সরকারও ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু সেই ধাক্কা থেকে সাধারণ মানুষকে অনেকটাই সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (UPA) সরকার জনমুখী নীতি চালিয়ে গিয়েছিল এবং আধার, শিক্ষার অধিকার আইন (RTE), পথব্যবসায়ী আইন ও খাদ্য সুরক্ষা আইন (ঘ(ঙ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে। তারা গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীলতার নজির রেখেছিল, যখন লোকপাল ও নারীদের সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপে লিপ্ত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরবর্তী বিভিন্ন সরকার ভারতের শুরুর কঠিন দিনগুলোতে;যখন চরম দারিদ্র্য সংঘর্ষ ও সংকটের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেছিল;তখনও গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলো তুলনামূলকভাবে অস্থিরতা ছাড়াই বাস্তবায়ন করেছিল। শিল্পায়নের ভিত, চিরস্থায়ী গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান গঠন ছাড়াও, যেসব গুরুত্বপূর্ণ আইন তখন প্রণীত হয় তার মধ্যে ছিল;পণপ্রথা বিরোধী আইন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আইন, দলত্যাগ বিরোধী আইন, শিশু শ্রম প্রতিরোধ আইন, অনগ্রসর জাতি-উপজাতির উপর নির্যাতন প্রতিরোধ আইন, পঞ্চায়েতি রাজ, এমপিএলএডিএস, রাজন্য প্রথা বিলুপ্তি, ব্যাংক জাতীয়করণ, মিড-ডে মিল প্রকল্প ইত্যাদি। সেই সময়ে রাজ্য পুনর্গঠন, সবুজ বিপ্লব, সাদা বিপ্লব, টেলিকম বিপ্লব, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশ, মণ্ডল কমিশনের বাস্তবায়নসহ বহু দীর্ঘমেয়াদী প্রভাববাহী আইন অস্থিরতা ছাড়াই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

মোদী, যিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে, তাঁর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এখনো পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি, তাঁর উচিত গভীরভাবে ভাবা;কেন তাঁর বহু সিদ্ধান্ত এত ব্যাপক প্রতিবাদ ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। সিএএ বিরোধী আন্দোলনের সময় বহু স্থানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে পুলিশি বল প্রয়োগ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানো হয়, সিভিল সোসাইটির সদস্যদের কেবল সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য বদনাম করা হয় ও গ্রেফতার করা হয়। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর, কাশ্মীরকে বলপ্রয়োগে স্তব্ধ করে রাখা হয়;হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করা হয়, মাসের পর মাস কারফিউ-সদৃশ পরিস্থিতি জারি থাকে, এমনকি ইন্টারনেট পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। গণতন্ত্রে এটি স্বাস্থ্যকর নয় যে, সরকারের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বারবার সন্দেহের কেন্দ্রে চলে আসে। বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন;ইউএপিএ-তে সংশোধনীকে গোটা বিরোধীপক্ষই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিল।

মুসলিম সম্প্রদায় আজ এক আশঙ্কার ছায়ায় বসবাস করছে;তাদের মন ও হৃদয়ে জমে আছে এক গভীর ভয়, যেন পরিকল্পিতভাবে তাদের প্রান্তিক করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। বুলডোজার ব্যবহার করে ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক কিংবা বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, নতুন করে মন্দির-মসজিদের বিতর্ক উসকে দেওয়া কিংবা তাদের সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে নিরব প্রচার;গত এক দশকে একটি পক্ষপাতদুষ্ট ও বৈষম্যমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় ও বহু রাজনৈতিক দলের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করানো এই আশঙ্কা ও ভয়ের আগুনকে আবারও উসকে দিয়েছে। যখন বিশ্ব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শুল্কযুদ্ধের সঙ্গে লড়ছে, তখন কি সামাজিক অস্থিরতা কাম্য? সিএএ ও কৃষি আইন থেকে মোদী সরকার কি আদৌ কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে? নাকি এসব ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ, যাতে বেকারত্ব ও আর্থিক দুর্দশা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা যায়?

কৃষকদের আস্থা না নিয়ে কৃষি আইন চাপিয়ে দেওয়ার কোনো মানে ছিল না। একইভাবে, মুসলিম সম্প্রদায়ের আবেগ ও আপত্তিকে উপেক্ষা করে ওয়াকফ বিল পাশ করানোরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। মোদীর বুঝতে হবে;গণতন্ত্রে পরামর্শের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি যদি তা না বোঝেন, তাহলে তাঁর ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা আবার নোটবন্দির মতো এক উন্মাদনায় পৌঁছাতে পারে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি করা উচিত। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন কৃষকদের জন্য এমএসপি (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য) দেওয়ার দাবি সমর্থন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আধারের বিরোধিতা করেছিলেন, আর প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাকেই গ্রহণ করেছেন। মনমোহন সিং-এর সময় ফার্স্ট-কাম-ফার্স্ট-সার্ভ ভিত্তিতে ২জি স্পেকট্রাম ও কয়লা ব্লক বরাদ্দের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু পরে নিজেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেই রায় পরিবর্তনের অনুরোধ জানান, যাতে নিলাম ছাড়াই স্পেকট্রাম বরাদ্দ সম্ভব হয়।

মোদীর অনুধাবন করা উচিত;'ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়া'-ই গণতন্ত্রে পরিণত নেতৃত্বের পরিচয়। যদি আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিভাজন ও শাসনের কৌশল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে দেশের স্থিতি ও সংহতি চরম ঝুঁকির মুখে পড়বে।

(দ্য ওয়ার থেকে অনুবাদিত)

পশ্চিমবঙ্গের গত পনেরো বছর

অশোক সরকার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ১৫ বছর শেষ হতে চলেছে। কাজেই তাঁর আমলে পশ্চিমবঙ্গের হাল কি এই আলোচনা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। নানা ভাবে আলোচনা হতে পারে। তাঁর ১৫ বছরের সঙ্গে আগের ১৫ বছরের তুলনা করে হতে পারে; ২০১১ সালে যে পরিস্থিতি ছিল তার তুলনায় ১৫ বছর পরে এখন কেমন, তা নিয়ে হতে পারে, তাঁর ১৫ বছরে জাতীয় গড়ের সঙ্গে তুলনা করে হতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, তাই সেটাই করার চেষ্টা করব। তবে একটা স্পষ্টীকরণ দিয়ে রাখি। পশ্চিমবঙ্গের হাল কি, তার উদাহরণ হিসেবে যেমন হাসপাতালে ডাক্তার/নার্স/যন্ত্রপাতির সংখ্যা বাড়ল কিনা বোঝায়, তেমনি শিশু মৃত্যু বা প্রসূতি মৃত্যু কমল কি বাড়ল, তাও বোঝায়। একটা সরকারি প্রচেষ্টা আরেকটা রাজ্যের ফলাফল। আমরা দ্বিতীয়টা নিয়েই কথা বলব।

মানব উন্নয়নের বেশ কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে জাতীয় গড়ের থেকে ভাল অবস্থায় আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যায় লিঙ্গ অনুপাত, শিশুদের জনসংখ্যায় লিঙ্গ অনুপাত, সাক্ষরতার হার, জন্মহার, মৃত্যুর হার, প্রজননের হার, শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল, dependency ratio (সমগ্র জনসংখ্যায় ১৫ বছরের কম ও ৬০ বছরের বেশি বয়সের মানুষের অনুপাত), ইত্যাদি সূচকগুলিতে তা লক্ষ করা যায়। শুধু যে আজ জাতীয় গড়ের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে তা নয়, ২০১১ থেকে ধারাবাহিকভাবে এই সূচকগুলির উন্নতিই হয়েছে, অবনতি হয় নি। দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে তুলনা করলে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে থাকবে। এটা নিশ্চয়ই সুখবর।

অবনতি হয়েছে যে সূচকগুলিতে সেগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মহিলা ও শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা, শিশুদের মধ্যে স্টান্টিং, ওয়েস্টিং জাতীয় সূচকগুলিতে নিশ্চিতভাবে অবনতি হয়েছে। এই সূচকগুলি পর্যাপ্ত ও সুষম পুষ্টির উপর নির্ভর করে, যার সবটা সরকারের হাতে নেই। তার জন্য পরিবারে পর্যাপ্ত আয় থাকতে হয়, মেয়েদের ও শিশুদের খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে হয়, পর্যাপ্ত ও সুষম পুষ্টি সম্বন্ধে সমাজে ধারণা পালটাতে হয়। আমাদের সমাজে পর্যাপ্ত খাদ্য সম্পর্কে যতটা ধারণা তৈরি হয়েছে, মেয়েদের ও শিশুদের সুষম পুষ্টি ও তার প্রয়োজন নিয়ে চেতনা অনেকটাই কম। তাহলেও অবনতির দায় সরকারকে নিতেই হবে।

পুষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের দায় সবটা না হলেও স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ২০১১-র তুলনায় ২০২৪এ এসেও প্রায় কিছুই উন্নতি হয় নি তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সরকারের। ২০১১-এ ৯০% মেয়েরা আট ক্লাস পর্যন্ত পড়ত ২০২৪শে তা প্রায় ৯৭%, তখন দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়ত ৭০% মেয়েরা এখন তা ৮৩%। ২০১১তেও তা জাতীয় গড়ের উপরে ছিল এখনো তাই আছে। দুটিই ভাল খবর। তবে কি শিখল এ প্রশ্ন না করাই ভাল। তাতে আসল ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়। যে দুটি সূচকে তা মাপা হয়, ভাষা শিক্ষা আর সাধারণ অঙ্ক শিক্ষা, ASER রিপোর্টে দুটিতেই দেখা যাচ্ছে, ২০১১-র তুলনায় ২০২৪ এ উন্নতি যৎসামান্য , মাত্র ৫-৬ ভাগ। এখনো অর্ধেকের কাছাকাছি ছেলেমেয়ে ভাষা শিক্ষা ও সাধারণ অঙ্ক শিক্ষার ন্যুনতম মান পেরোতে পারছে না। স্কুলছুটের সংখ্যায় ২০১১-র তুলনায় প্রাথমিক স্তরে অনেকটাই উন্নতি হলেও নয় থেকে ১২ ক্লাসের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ছাত্র স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ স্কুলে সবাই যাচ্ছে কিন্তু যে ক্লাসে যা শেখার কথা, তা শিখছে না কিছুই এবং আট ক্লাসের পরে ক্রমশ স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে এটাই সর্বজনীন সত্য।

কৃষির দিকে তাকালে সেই মিশ্র ছবিই দেখতে পাই। ১৫ বছরে নেট চাষের বা সেচের এলাকা প্রায় একই থেকে গেছে। ধান গম উৎপাদন সামান্য কমেছে, কমেছে আখ বা পাটের চাষ। কিন্তু অনেক বেড়েছে দানা শস্যের, ডালের উৎপাদন (তিন থেকে সাত গুণ), আর সামান্য বেড়েছে ফল আর সবজির উৎপাদন(২৪ থেকে ৩৪ ভাগ)। শ্রমশক্তির ৪৫ ভাগ ২০১১-তে কৃষি নির্ভর ছিল এখন তা কমে হয়েছে ৩৫ ভাগ। দেশের তুলনায় তা ২০১১-তেও ১০ ভাগ কম ছিল এখনো তাই। ধান গম পাটের উৎপাদন কমেছে দানাসশ্য, ডাল ফল সবজির উৎপাদন বেড়েছে, এটা নিশ্চিত সুলক্ষণ কিন্তু তাতে চাষির রোজগার বেড়েছে কি? এক কথায় উত্তর ' না।' কৃষি থেকে আয় এখনো মাসে গড়ে দশ কি এগারো হাজার টাকার বেশি নয়। ভারতের জাতীয় গড়ের থেকে তা কম তো বটেই, একমাত্র বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা আর উত্তর প্রদেশ আমাদের পিছনে। কৃষিতে প্রকৃত মজুরি (real wage) সামান্যই বেড়েছে , ২০১১-১২-তে সালে কৃষিতে প্রকৃত মজুরি যেখানে ১২০ টাকার মত ছিল তা ২০২৪শে এসে তা ১৫০ টাকা হয়েছে। মানে ১৫ বছরে মাত্র ৩০ টাকা বেড়েছে! তখনও তা জাতীয় গড়ের চেয়ে ২০-২৫ টাকা কম ছিল এখন তা ৩৫-৪০ টাকা কম।

শিল্পের দিকে তাকালেও সেই একই ছবি। ১৫ বছরে ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা বেড়েছে মাত্র দেড় লাখ। এই সময়ে মাত্র ১০০০টি নতুন ফ্যাক্টরি হয়েছে, কটা বন্ধ হয়েছে জানা যাচ্ছে না।

তুলনায় ২০১১ সালে ৮০ লক্ষের মত ক্ষুদ্র উদ্যোগ ছিল তা বেড়ে হয়েছে ৯২ লক্ষ, কিন্তু সেখানেও কর্মী সংখ্যা আগে এক কোটি ২০ লক্ষ ছিল এখন হয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষের মতই আছে, অর্থাৎ গড়ে এক একটি উদ্যোগ আগেও দেড় জনের মত মানুষকে কাজ দিত এখনো তাই। প্রকৃত মজুরি খুবই সামান্য বেড়েছে , ২০১১-তে ছিল দৈনিক ১৮৫ টাকা, ২০২৪ শে হয়েছে ২৪২ টাকা। ১৫ বছরে ৫৭ টাকা বেড়েছে! তখনো তা জাতীয় গড়ের চেয়ে ১৫-২০ টাকা কম ছিল এখনো প্রায় ২০ টাকা কম।

মেয়েদের অবস্থার দিকে তাকানো যাক। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে এই সরকার যে মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মেয়েদের অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটেছে এই ১৫ বছরে? ২০১১-তে মেয়েদের প্রতি অপরাধের সংখ্যা ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ছিল ২৯,১৩৩, সেটা ২০২৪শে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৪০০০-এর কিছু বেশি। মাঝে ২০১৪ সালে ৩৮০০০ ছাড়িয়েছিল, তারপর কমেছিল আবার ২০২০ সালে ৩৬০০০ ছাড়িয়েছিল, এখন তার থেকে একটু কমেছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান দেশের মধ্যে উপর থেকে চতুর্থ, জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। শুধু যে অপরাধ থানায় লেখানো হয়েছে তার ভিত্তিতে এই তথ্য, আসলে কত অপরাধ ঘটেছে তা কেউ জানে না। তেমনি ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়াতেও পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য অনুসারে ২০১১ সালে ছিল তা ছিল ৫৪%। অর্থাৎ ২০ থেকে ২৪ বছরের মেয়েদের জিগ্যেস করলে জানা যায় তাদের ৫৪ ভাগের বিয়ে ১৮ বছর পূর্ণ করার আগেই হয়েছে। সেটা ২০১৯-২০২১ এর তথ্য অনুযায়ী কমে হয়েছে ৪২%, তবে এখনো তা জাতীয় গড়ের প্রায় দ্বিগুণ, এবং দেশের মধ্যে প্রথম। তবে একটা স্পষ্টীকরণ দিতেই হবে, যে মেয়েদের সহায়তা প্রকল্পগুলির প্রভাব বুঝতে গেলে পরবর্তী সমীক্ষার জন্য অপেক্ষা করাই হয়ত সমীচীন হবে।

তেমনি মেয়ে শ্রমিকদের ছবিটাও আপাতদৃষ্টিতে আশা ব্যঞ্জক হলেও আসলে তা নয়। ২০১১তে মেয়ে শ্রমিকদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের অনুপাত ছিল ১৯% মানে কর্মক্ষম মেয়েদের মাত্র ১৯ভাগ কাজে যুক্ত ছিলেন বা কাজ খুঁজছিলেন। সেটা ২০২৪শে এসে হয়েছে ৪৩% মানে অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখব আসলে কর্মরত মহিলাদের ৭৫ ভাগই স্বনিযুক্ত, বা সেলফ এমপ্লয়েড, এবং তার প্রায় অর্ধেক আসলে পরিবারের বিনা পয়সার শ্রমিক! আর ক্যাসুয়াল শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় কমে গেছেন। ২০১৭ সালে ছিলেন নিযুক্ত শ্রমিকদের ৩৫ ভাগ ২০২৪ শে হলেন ১৫ ভাগ। গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত মাইনে পান এমন মহিলা কর্মীদের সংখ্যা মোট মহিলা শ্রমিকদের ১৮ ভাগ ছিল, হয়ে গেছে ৯ ভাগ, শহরেও ৪৪ থেকে ৩৩ ভাগ হয়ে গেছে। যেহেতু কৃষিতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মেয়েরা যুক্ত তাই যদি কৃষি মজুরি দেখি দেখব ২০১৩ তে যেখানে মজুরি ছিল ১৮২ টাকা ২০২৪ শে এসে হয়েছে ৩৬০ টাকা, অর্থাৎ ১৫ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। প্রকৃত মজুরি দেখলে তা অনেকটাই কম হবে। কাজেই মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই রাজ্য বিশেষ কোনও কৃতিত্বের দাবি করতে পারে কি? এক্ষেত্রে জাতীয় গড়ের সঙ্গে অবশ্য বিশেষ কোনও তফাত নেই। একটাই ভাল খবর যে দেশের মধ্যে মহিলা চালিত ক্ষুদ্র উদ্যোগে আমরা প্রথম হয়েছি।

সামগ্রিক অর্থনীতিতেও ছবিটা আশাব্যঞ্জক নয়। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা বড় মাপকাঠি হল রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদন। ২০১১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ব্যক্তি প্রতি state domestic product (SDP) মূল্যবৃদ্ধি বাদ দিলে অর্থাৎ constant price-এ মাত্র ৬০ ভাগ বেড়েছে। বড় রাজ্যগুলির মধ্যে শেষ থেকে তৃতীয়। প্রকৃত মূল্যে SDP বেড়েছে ৪.৩% হারে, জাতীয় গড়ের (৫.৬%) চেয়ে অনেক কম। উৎপাদন ও পরিষেবা মিলিয়ে, রাজ্যে খরচা বাদ দিয়ে কতটা নেট মূল্য তৈরি হচ্ছে তাকে gross state value added îy GSVA বলে। এক দশকে এই রাজ্যে তার বৃদ্ধির হার হল গড়ে ৪.৮ যা জাতীয় GSVA-র বৃদ্ধির হারের (৫.৭%) এর চেয়ে অনেকটাই কম। একই ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্যাঙ্কের ঋণ ও জমার অনুপাত দেখলে। এই অনুপাত ২০১১-তে ছিল ৬৫% এর মত, ২০২৪শে এসে হয়েছে ৫২%,জাতীয় গড় হল ৭১%। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে সব ব্যাঙ্ক মিলিয়ে যদি বছরে ১০০০টাকা জমা হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলি পশ্চিমবঙ্গে ঋণ দিচ্ছে তার মধ্যে মাত্র ৫২০ টাকা। বাকি টাকা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। সামগ্রিক অর্থনীতির আরেকটি হিসাব হল রাজ্যে কতটা দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ তৈরি হচ্ছে। ইংরেজিতে বলে gross fixed capital formation (GFCF)। সহজ কথায় বললে ফ্যাক্টরি, মেশিনারি, বিল্ডিং, অন্যান্য পরিকাঠামো, ইত্যাদি। ২০১১-তে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল উপর থেকে ছয় নম্বরে, ২০২৪শে এসেও তাই আছে যদিও সংখ্যার হিসেবে তা এক লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকা থেকে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতই হল খুচরো ব্যবসা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্যোগ, আর সরকার রাজস্ব ব্যয়। তাতে রাজ্যের SDP বাড়লেও, GFCF আর SDP-র অনুপাত বাড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপাত ২৭-২৮%, শিল্পোন্নত রাজ্যগুলিতে ৩২-৩৫% এর মত। বেকারত্বের হিসাবে

পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের চেয়ে কম হলেও শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা মারাত্মক , মাধ্যমিক পাসদের মধ্যে বেকারত্ব ৯%, উচ্চমাধ্যমিকদের মধ্যে ১০%, গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ২০%র বেশি, আর পোস্ট গ্রাজুয়েটদের মধ্যে প্রায় ১৫%। এই রকম অনেক তথ্যই দেওয়া যায় যার মূল মেসেজটি হল গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নি তা নয়, তবে তা বিশেষ করে বলার মত নয়।

সব মিলিয়ে এই রাজ্যের গত ১৫ বছরের যে ছবিটি ধরার চেষ্টা করলাম তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কিন্তু ফাঁকগুলি পূরণ হলেও সামগ্রিক ছবিটা বদলাবে কি? যে সামগ্রিক ছবিটা পেলাম তাকে কেউ বলেন স্থবিরতা, আমি বলব মন্থরতা। এই রাজ্য এগোচ্ছে, কিন্তু অতি মন্থর গতিতে। সঙ্গে এও বলা যায় যে উন্নয়নের পরিধি বেড়েছে, বাড়েনি তার গুনমান।

তথ্য সূত্র ঃ ▮ RBI Handbook of statistics on Indian states 2024-25 ▮ NABARD All India Rural Financial Inclusion Survey 2021-22 ▮ NCAER-NITI Ayog study of Macro and Fiscal landscape of West Bengal 2023-24 ▮ Annual Report of the Ministry of micro small and medium enterprises 2024-25 ▮ RBI table on credit deposit ratios of Indian states PLFS 2023-24

রূপান্তরকামীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে আইন আনলো কেন্দ্র

মিলন দত্ত

আরও একটা ভয়ঙ্কর মানবতাবিরোধী আদিম আইন নিয়ে এল নরেন্দ্র মোদীর আরএসএস পোষিত বিজেপি সরকার। সেটা হল 'রূপান্তরিত বা রূপান্তরকামী সুরক্ষা সংশোধনী বিল' ['ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (প্রোটেকশন অব রাইটস) সংশোধনী বিল ২০২৬]। বিরোধিরা বিলটিকে বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। সে প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। ওই আদিম অনাধুনিক হিন্দুত্ববাদী বিলটি লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায়। তার আগেই সংসদের উচ্চকক্ষেও ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হয়।

নতুন বিলে ২০১৯ সালের সংশোধিত রূপান্তরকামী সুরক্ষা আইনে কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এতদিন 'ট্রান্সজেন্ডার নাগরিক' তাঁর নিজের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করতে পারতেন। যেমন করে একজন পুরুষ ও নারী নিজেকে পরিচিত করান। নতুন আইন বলছে কোনও রূপান্তরকামী মানুষ নিজের পরিচয় নির্ধারণ করতে পারবেন না। তাঁর পরিচয় নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র; ডাক্তরি পরীক্ষার পরে। অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছায় আর নিজের লিঙ্গপরিচয় নির্ধারণ করা যাবে না। কিছু দিন আগে এই বিল লোকসভায় উত্থাপিত হওয়ার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়। সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়ে বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগোল। নতুন এই বিলে 'ট্রান্সজেন্ডার'-এর সংজ্ঞা সংকুচিত করা হচ্ছে এবং লিঙ্গপরিচয় নির্ধারণের পদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে। জোর করে অঙ্গহানির মাধ্যমে লিঙ্গ রূপান্তরের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধানও রয়েছে বিলটিতে। অভিযোগ, নতুন বিলে ব্যক্তির নিজের লিঙ্গ নির্বাচনের অধিকার থাকবে না। ডাক্তারি বোর্ড তা করবে। অর্থাৎ, শরীরগত ভাবে ভিন্ন উভলিঙ্গ (ইন্টারসেক্সড) ও বৃহন্নলা, আরাবনী, যোগিতা, কিন্নরের মতো পরম্পরাগত সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যেরাই রূপান্তরকামীর তকমা পাবেন।

কিন্তু বিল পাশ হওয়ার পরের দিনই এই বিল প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করা এক উপদেষ্টা কমিটি। দ্য হিন্দু এবং সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন বিচারপতি আশা মেননের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি জানিয়েছে, বিলটিতে নিজের লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। কমিটির মতে এটি শীর্ষ আদালতের ২০১৪ সালের ঐতিহাসিক 'নালসা' রায়ের পরিপন্থী।

২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক 'নালসা' রায়ে বলা হয়েছিল, লিঙ্গ পরিচয় মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির বিষয়। একজন মানুষ নিজেকে পুরুষ, মহিলা বা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে পরিচয় দিতে চাইলে, সেটাই আইনি স্বীকৃতি পাবে। এর জন্য কোনও ডাক্তারি পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচারের প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬ এবং ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রূপান্তরকামীদের শিক্ষা, চাকরি এবং বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রের আনা নতুন বিলে বলা হয়েছে, মেডিক্যাল বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়া 'রূপান্তরকামী'-র শংসাপত্র মিলবে না। অর্থাৎ সে নাগরিক হিসেবে তার মৌলিক অধিকারটুকু হারাবে।

কে তৃতীয় লিঙ্গের, তা নির্ধারণ করতে এখন থেকে মেডিকেল বোর্ড বা জেলা শাসকের সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক হল। ২০১৪ সালের 'নালসা' রায় মোতাবেক নিজেকে রূপান্তরকামী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার অধিকার এই আইনে খর্ব হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চান, তবে তাকে সংশোধিত সার্টিফিকেট নিতে হবে এবং মেডিকেল প্রতিষ্ঠানকে জেলা শাসকের কাছে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। রূপান্তরকামী হিসেবে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সুবিধা গ্রহণ রোধে এবং জোরপূর্বক লিঙ্গ পরিচয় গ্রহণে বাধ্য করলে

বা অপহরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজা ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে নতুন বিলে।

রূপান্তরকামীদের উপরে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, বৈষম্য, জোর করে কাজ করানো বা অন্য কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে দোষীর সর্বোচ্চ সাজার মেয়াদ ছিল ২ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা। নতুন বিলে সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে।

রাজ্যসভায় সংশ্লিষ্ট এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নমন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার জানান, সমাজের সকল অংশকে একত্রে নিয়ে চলার প্রচেষ্টা এই বিল। তাঁর কথায়, 'শুধুমাত্র জৈবিক কারণে যাঁরা বৈষম্যের শিকার হন, তাঁদের সুরক্ষা দেওয়া এই বিলের লক্ষ্য। রূপান্তরিত বা রূপান্তরকামী নাগরিকেরা যাতে সামাজিক সুরক্ষা পেতে থাকেন, তা এই সংশোধনী নিশ্চিত করবে। মোদী সরকার এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' মন্ত্রী আরও জানান, রূপান্তরিত এবং রূপান্তরকামী নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দেশের ৩০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 'ট্রান্সজেন্ডার কল্যাণ বোর্ড' তৈরি করা হয়েছে।

কেন্দ্রের এই অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী দলগুলি। কেন এত তাড়াহুড়ো করে বিলটি পাশ করা হচ্ছে, প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী সাংসদেরা। সিপিএম সাংসদ জন ব্রিট্রাস সংবিধানবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়, 'এটা একটা কালো দিন। এই পদক্ষেপ আমাদের এক শতাব্দী পিছিয়ে দিতে চলেছে। বর্তমানে ৩০টিরও বেশি দেশ এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু আমরা বিধিনিষেধ আরোপ করে আরও পিছিয়ে যাচ্ছি।' এই বিলের মাধ্যমে রূপান্তরকামীদের জোর করে যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন ব্রিট্রাস। তিনি আরও বলেন, 'এত তাড়া কিসের? মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, এ ভাবে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের রোষের কারণ হবেন না। দয়া করে বিলটি প্রত্যাহার করুন অথবা তা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

নতুন বিলে রূপান্তরকামী হিসাবে কাউকে পরিচিত হতে বললে বা ওই পরিচয় গ্রহণের জন্য প্রলুব্ধ করলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। এই বিধান অস্পষ্ট এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসক, পরিবারের সদস্য কিংবা বন্ধুবান্ধব বিপদে পড়তে পারেন। সুরক্ষার পরিবর্তে তাদের ভয় আরও বেড়ে যাবে। বছরের পর বছর ধরে যাঁদের প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁদের বিপদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, হিন্দুধর্মে রূপান্তরকামী ও হিজড়াদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকভাবে জটিল, যেখানে ধর্মীয়ভাবে মেনে নিলেও সামাজিকভাবে তাঁদের অতি প্রান্তিক করে দেওয়ার প্রবণতা গোটা হিন্দু সমাজেই রয়েছে। হিন্দুদের শাস্ত্রে 'তৃতীয় লিঙ্গ' বা 'তৃতীয়া প্রকৃতি'র অস্তিত্ব স্বীকৃত। অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন যে আত্মা লিঙ্গাতীত এবং আধ্যাত্মিক সমতার কারণে রূপান্তরকামীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই ঘটে থাকে। হিন্দু ধর্মে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধে শিখণ্ডী এবং অর্জুনের বৃহন্নলা রূপের ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রূপান্তরকামীদের নিয়ে হিন্দু সমাজের এই দ্বিচারিতা বিশ্বাসীদের তণ্ডকতাকেই প্রকট করে তোলে। কেন্দ্রে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকারের সাম্প্রতিক বিল এই দ্বিচারিতাই প্রকাশ।

রূপান্তরকামী মানুষদের সংগঠন 'ট্রান্স-কুইয়ার কালেক্টিভ'-এর পক্ষ থেকে 'রূপান্তরিত বা রূপান্তরকামী সুরক্ষা সংশোধনী বিল'-এর বিরোধিতা করে প্রচারিত একটি আবেদন এখানে যুক্ত করা হল। এই আবেদনে নতুন বিল নিয়ে তাঁদের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে:

■ ট্রান্সজেন্ডার আইনের ২০২৬-এর সংশোধনী বাতিল কর।

এই ১৩ মার্চ বিজেপির সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার ২০১৯-এর ট্রান্সজেন্ডার আইনে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। এই প্রস্তাবিত সংশোধনী কেন বিপজ্জনক?

■ আমাদের লিঙ্গ-পরিচয় অস্বীকার করছে

দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, নিজের লিঙ্গ পরিচয় ঠিক করতে পারা যে কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই আইন সেই অধিকার খাতায়-কলমে বাতিল করে দিচ্ছে।

■ আমাদের ওপর বিপুল নজরদারি চালাতে চায়

এমনকি কেউ যদি নিজেকে টান্সজেন্ডার বলতেও চায়, তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের মেডিকেল বোর্ডের সামনে কাপড় খুলে প্রমাণ করতে হবে সে ট্রান্সজেন্ডার। কিন্তু আমরা শাড়ি কাপড় খুলব না। এই সংশোধনী মানব না।

শুধু তাই নয়, লিঙ্গ রূপান্তর সংক্রান্ত চিকিৎসা পাওয়াও আরো কঠিন করে দিচ্ছে।

■ বহু মানুষ বাদ পড়বেন

একেই বিপুল সংখ্যায় প্রান্তিক লিঙ্গ যৌনতার (ট্রান্স-কুইয়ার) মানুষ এনআরসি এসআইআর-এ বাদ পড়েছেন। এই বিল পাশ হলে আরো বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের পরিচয়পত্র হারাবেন। সমস্ত ট্রান্সজেন্ডার মানুষ তাদের আইনি পরিচিতি হারাবেন। আদিবাসী ট্রান্স

মানুষদের আর কোনো পরিচিতি থাকবে না। সরকারি তালিকায় বাদ পড়েছেন পাঞ্জাবের 'খোয়াজা সি'-রা, তামিলনাড়ুর থিরুনাঙ্গাই ইত্যাদি ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীও।

■ আইন অপব্যবহারের আশঙ্কা

বিলের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে নতুন যে ধারা আনা হয়েছে তাতে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের যাঁরা বাড়িতে থাকতে দেবেন বা থাকার জায়গা খুঁজতে সাহায্য করবেন, যাঁরা আমাদের লিঙ্গ রূপান্তরের চিকিৎসা করাতে সাহায্য করবেন, সবার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে। ১০ বছর অবধি জেল হতে পারে। 'হিজড়ারা বাচ্চা চুরি করে'; মান্ধাতার আমলের ধারণা ফিরিয়ে এনে এই বিল আমাদের অপরাধী বলে দাগিয়ে শাস্তি দেবে।

■ ভাত কাপড় পড়াশোনা ও চাকরি অধিকার কেড়ে নিচ্ছে

আমাদের পরিচয়টাই মুছে দিয়ে স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়ার, চাকরি করার রাস্তাই বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনিতেই আমাদের বিরুদ্ধে বিরূপ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। এই সংশোধনী এলে সমাজে আমাদের যুক্ত হওয়ার রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকারটাও থাকবে না।

সাথী, আমরাও আপনাদের মতোই, আপনাদের সাথেই এক সমাজের অংশ। এই মাটিতেই আমাদের জন্ম। আজকে সরকার যদি খোলামকুচির মতো আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারই কেড়ে নিতে পারে কালকে সে যে আপনার জীবন জীবিকার অধিকার, ব্যক্তিগত জীবন ধারণের অধিকারে আক্রমণ করবে না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে!

না, নেই। সে ইতিমধ্যেই নানা আইন এনেছে সমস্ত সাধারণ মানুষের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে। তাই আপনিও এই লড়াইয়ে শামিল হোন। ট্রান্স আইন সংশোধন বাতিল হোক।

কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতির কারণে বিপন্ন আলুচাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী

শান্তি পাহাড়ী

সরকার শিল্পজাত পণ্যের মূল্য কত হবে তা নির্দ্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিল্প মালিকদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে । কিন্তু কৃষিকার্যে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রেও কোনরকম নূন্যতম বাজার মূল্য কৃষক পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে সরকার উদাসীন। ফলস্বরূপ দেশের কৃষকসমাজ উভয়ক্ষেত্রে শাঁখের করাতের মতন বলি হয়ে চলেছেন;তাঁরা কৃষি উৎপাদনে যে সব শিল্পজাত পণ্য প্রয়োজন হয় তা অস্বাভাবিক মূল্যে ক্রয় করে কৃষি উৎপাদন করে থাকেন । আবার যখন কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলসমূহ তোলার পরে কোনরকম লাভজনক দাম পাওয়া তো দুরের কথা , উৎপাদিত পণ্য উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কম দামে বিক্রয় করে বারে বারে ক্ষতি স্বীকার করে চলেছেন।

এই বিষয়ে দেশে কংগ্রেস শাসনাধীনকালে সংসদে বিতর্কের পর কংগ্রেস সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্বামীনাথন কমিশন কৃষকের দুরাবস্থার বিষয়ে সমীক্ষা চালানোর পর যে রিপোর্ট সংসদের কাছে জমা দিয়েছিলেন তা কৃষক দুরবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছিল তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর থেকে কৃষক সমাজের পরিত্রাণের জন্য ঐ রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছিল , কৃষি উৎপাদন ব্যয়ের দ্বিগুণ মূল্য সরকারকে MSP বাবদ ধার্য্য করতে হবে।কোথাও তার কম দামে যেন কৃষককে তার উৎপাদিত ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হতে না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রয়োজনে সরকারকে ঐ মূল্যে কৃষকের উৎপাদিত ফসল ক্রয় করতে হবে। এই রিপোর্ট তৎকালীন সময়ে সংসদে অনুমোদিত হওয়া সত্বেও কেন্দ্রের বর্তমান সরকার কৃষকদের স্বার্থবিরোধী কৃষি আইন প্রণয়ন করে কর্পোরেট স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল। প্রবল কৃষক আন্দোলনের চাপে কৃষক স্বার্থ বিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহৃত হলেও কৃষিপণ্যের ন্যূনতম বাজার দর নির্দ্ধারণে কোনরকম উদ্যোগ নেওয়া তো দুরের কথা বরং কর্পোরেট পুঁজির কাছে কৃষক সমাজকে বলি প্রদত্ত করা হচ্ছে। যার ফলে সারা দেশে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে। ঋণভারে জর্জরিত কৃষকসমাজ গভীর সংকটের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের অবস্থা ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছেছে। বাগাড়ম্বরের প্রচার সর্বস্বতায় রাজ্যের 'কৃষক বন্ধু' কিংবা কেন্দ্রের 'কৃষক দরদে' যা জোটে তার চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেশি।

এই রকম ভয়াবহ অবস্থার মাঝে বর্তমান বছরে এই রাজ্যের আলুচাষীদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। রাজ্যের মধ্যে পশ্চিম-মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হাওড়ার কিয়ৎঅংশে ব্যাপক আলু চাষ হয়। সমগ্র রাজ্যে আলুর চাহিদা মেটানো ছাড়াও অন্য রাজ্যসমূহে এমনকি বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মতন বিদেশেও এই রাজ্যের আলু রপ্তানি করা হোত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এই রাজ্যের সরকার ২০১৪ সালে এবং ২০২৪ সালে আলুর দাম উর্দ্ধমুখী হলে রাজ্যের সীমানা সিল করে বাইরের রাজ্যে কিংবা বিদেশে আলু রপ্তানি বন্ধ করে দেয়।

ফলে বাইরের রাজ্যগুলিতে যেমন আলু চাষের উপর জোর দেওয়া হয় অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের আলু যে সমস্ত রাজ্যে যেত তার বাজারগুলি দখল করে নেয় উত্তর প্রদেশের আলু। সরকার ট্যাক্স বসিয়ে এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার কারণে আলু চাষের উপকরণ সমূহের দাম এতটাই বৃদ্ধি করেছে তার ফলে এবং কৃষির উপর থেকে কৃষকদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে ভর্তুকি দেওয়া হোত তা তুলে দেওয়ার ফলে বিঘা প্রতি উৎপাদন ব্যয় গড় ৩৮-৪০ হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বীজ, সার, কীটনাশক সহ কৃষি উপকরণের দাম বেড়েছে কয়েক গুণ। আলু ওঠার মুখে যে বস্তার দাম ছিল প্রতিটি ১১-১২ টাকা (আলু ছারা) , বর্তমানে সেই বস্তার দাম হয়েছে ৩৫-৪০ টাকা (আলু ছারা) । মাত্র ১৫-২০ দিনের মাথায় এই দাম বৃদ্ধিতেও সরকারের কোনরকম ভুক্ষেপ নেই। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে বহু স্থানে আলুর দাম না থাকায় ঋণগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে দুর্বলচিত্তের বেশ কিছু কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার ১নং ব্লক এলাকার রাঙামাটি গ্রামের রাখাল আড়ি নামের তপশীলি জাতিভুক্ত এক বর্গা আলু চাষী মহাজনের কাছ থেকে ধার দেনা করে চার বিঘা জমিতে আলু চাষ করে কোন দাম না পাওয়ায় ঋণভারের ভয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এরকম হুগলী জেলাতেও ঘটছে এবং অন্যত্রও ঘটছে। অথচ রাজ্যের সরকার জানাচ্ছে এই রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যা শূন্য। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর কাছে প্রেরিত এক দশকের সরকারি তথ্য এর প্রমাণ স্বরূপ। একটা প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে কৃষকের এত আলু চাষের বাতিক কেন? কেউ প্রশ্ন করছেন না সরকারের ব্যর্থ কৃষিনীতির ফলেই যে কৃষক সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমস্যা তুলে ধরার জন্যে কোনও প্রয়াস নেই। রাজনৈতিক দলসমূহের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কৃষক ঐক্য সেভাবে জোট বাঁধতে পারছে না।

এক্ষেত্রে কৃষকদের মানসিকতাও অনেকখানি দায়ী; অতীতের আধা সামন্ততান্ত্রিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবকে কাটানোর জন্যে বাম ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ, রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উর্দ্ধে উঠে এ পর্যন্ত সেই চেষ্টা করেনি। সে কারণে কৃষক সমাজ বিভক্ত নানান অংশে। তার উপর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, ধনী কৃষকদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। সকলের সমস্যা এক রকমের নয়। আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী অন্নদাতা কৃষক সমাজকে নিয়ে সম্পূর্ণ রকমের অবজ্ঞার কারণে কৃষক সমাজের ব্যাপকতম অংশ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষেতমজুর ও পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। কৃষককে রুজিরোজগারের জন্যে চাষাবাদ বাধ্যতামূলক করতেই হবে। কৃষকের বাড়ীর শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বেকার। সরকারের পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন ব্যবস্থা যে প্রকৃত উন্নয়ন নয় সেটাই প্রমাণ করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কৃষকের দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রণা। আলুর ক্ষেতে কৃষক বাড়ীর গৃহবধু, গৃহস্বামী আলুর কাঁড়ির কাছে শুয়ে পড়ে মাথা কুড়ছে, আলু উৎপাদনের জন্যে এবং আলু ফসলের লালন পালন করার পর তাকে ঠিকমত গচ্ছিত করতে না পারার কারণে বুক চাপড়ে কাতরাচ্ছে।

রাজ্যের সরকার টি.ভি ও মিডিয়া মাধ্যমে প্রচার করেই খালাস সরকার সাড়ে নয় শত টাকা করে প্রতি কুইন্টাল আলু ক্রয় করবে। কোথাও ঐ দামে কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদিত আলু কেনার জন্যে কোনরকমের উদ্যোগ নেই। বর্তমানে কৃষকের কাছ থেকে আলু ২০০ টাকা কুইন্টালেও কেউ ক্রয় করছে না। বর্তমান বছরে আলুর ফলন সন্তোষ জনক। বিঘা প্রতি গড়ে ৫০ কুইন্টাল আলু উৎপাদিত হয়েছে। খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ হাজার টাকা। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হিমঘরে আলু গচ্ছিত করার মতনও ক্ষমতা নেই। প্রতিটি ৫০ কেজির জন্য একটি বস্তা ক্রয় করতেই ৩৮ থেকে ৪০ টাকা। তার লোডিং, আনলোডিং, গাড়ী ভাড়া। হিমঘরে নিয়ে গেলে প্রতি কুইন্টলে খরচ প্রায় ১২০০ টাকার কাছাকাছি। সে কারণেই আলুর ন্যূনতম দাম হওয়া উচিৎ ১২০০ টাকা কুইন্টল। কিন্তু কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী শাসক শ্রেণী কৃষক জীবনের দুর্দশার শরিক নয় বরং কৃষক জীবনের যন্ত্রণাকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে। এর উপর ২০-২১ মার্চের বজ্র বিদুৎসহ প্রবল বর্ষণে আলুচাষের মাঠ জলে ডুবে আলু ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কোন কোন এলাকায় এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। কয়েকটি হিমঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আলু সংরক্ষণের জায়গাও কমেছে। ১৫০-২০০ টাকা কুইন্টল দরে কৃষকের আলু ফড়ে মারফৎ কিছু কিছু কর্পোরেট পুঁজির মালিক হিমঘরে মজুত করছে। আর পুঁজিপতিদের লাভ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বড় বড় পুঁজির প্রচারযন্ত্র বৈদ্যুতিন, কিংবা প্রিন্ট মিডিয়ায় কোথাও আলু চাষীদের এই দুরবস্থার কথা একলাইনও লেখা হচ্ছে না।

কৃষক সমাজকে বুঝতে হবে তার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির পথ আত্মহত্যায় নয়; এটা ভীরুতা, কাপুরুষতা কিংবা স্বার্থপর পলায়ন প্রবৃত্তি। কৃষক জীবনের পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র থেকে তীব্রতর ঘৃণা ও ক্রোধের জাগরণ। আর এই ঘৃণা ক্রোধ বর্ষিত হোক্ একচেটিয়া পুঁজির প্রতি। কৃষককে মেরেই এদের পুঁজির স্ফীতি। কৃষকের পাশে থাকতে হবে শোষিত শ্রমিক, মজুর, ছাত্র, যুব-মহিলা, কেরানী কর্মচারী, শিক্ষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সমাজের সব অংশের বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষজনকে। কৃষি

ও কৃষক না বাঁচলে সমাজ-সভ্যতা সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই কারণে মূল কতকগুলি দাবী নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সংগঠিত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সরকারকে বাধ্য করতে হবে বহু খাদ্যগুণ সম্পন্ন আলু-কে কৃষি ফসল হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে। সরকারকে আলুর সহায়তা মূল্য ১২০০ টাকা কুইন্টল ঘোষণা করে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ক্রয় করতে হবে। বিদ্যুৎ বিল কৃষিক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের আলু দেশের মধ্যে যে সমস্ত রাজ্য কিংবা বিদেশেও রপ্তানি হোত সেই সমস্ত জায়গায় আলুর রপ্তানি বাড়াতে হবে। উন্নত মানের বীজ রাজ্যের অভ্যন্তরেই তৈরি করতে হবে। সরকারি বীমা সংস্থায় ফসলের বীমা করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, সমবায় সহ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দিয়ে কৃষকদের সহায়তা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের বীমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর প্রক্রিয়াকরণ শিল্প আলু উৎপাদিত জেলাগুলিতে অধিক সংখ্যায় গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি মৌজা অনুযায়ী আলু চাষের উপযোগী ডালশষ্য, তৈলবীজ, ধান, গম শষ্য, সব্জী উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিকে কৃষককে সাথে নিয়ে সরকারি কৃষি বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পনা মাফিক চিহ্নিত করণের কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

কৃষক সমাজকে বুঝতে হবে কপালের দোষে আপনার বিড়ম্বনা বা বিপর্যয় নয়। এই বিপর্যয় শাসকের কৃষি ও কৃষক মারার নীতির কারণেই। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে কৃষক সমাজকেও ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত কৃষক সমাজকে বেছে নিতে হবে তাদের স্বার্থ কে রক্ষা করতে সহায়তা করবে, কোন্ রাজনৈতিক পক্ষ; সেই রাজনৈতিক পক্ষকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

অপারেশন এপিক ফিউরি ও অপারেশন রোরিং লায়ন

অমিতাভ সিংহ

এই দুটি নামের মাধ্যমে ইরানের ওপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণের চার সপ্তাহ অতিক্রান্ত হল।প্রথম ছয় দিনে এই খাতে আমেরিকার খরচ হয়ে গেছে ১২৬৩ কোটি ডলার বা এক লক্ষ সতের হাজার কোটি টাকা। সুতরাং গত একমাসে এর পরিমান কত তা সহজেই অনুমেয়।

ট্রাম্পের অবস্থা এখন সাপের ছুচো গেলার মত। এপস্টিন ফাইলে তার কেচ্ছার কিছুটা প্রকাশ হওয়া ও বিভিন্ন দেশের আমদানীর ওপর যথেচ্ছ শুল্ক চাপানোর ওপর বিজ্ঞপ্তি খারিজ হওয়ার ফলে ট্রাম্প যৎপরোনাস্তি চাপে ছিলেন।ফলে একটা কিছু করে দেখানোর তাগিদ থেকেই যে এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত তা নিয়ে আর কোন দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর তিনি ও বেন্জামিন নেতানিহাহু আজ পৃথিবীর সবচেয়ে নিন্দিত ও ঘৃণার বস্তু। এখন ট্রাম্প ইজরায়েলকে বলছে যেন তারা ইরানের গ্যাস কেন্দ্রে হামলা না করে। কদিন আগেই ইরানের একটি বড় প্রাকৃতিক গ্যাস কেন্দ্র সাউথ পার্সে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল। ফলে ইরানও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তেল স্টেশনের ওপর হামলার হুঁশিয়ারি দেয়। জ্বালানি স্টেশনগুলি এই যুদ্ধের পরিমন্ডলের একটি অংশ হওয়ায় সারা বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু হয়ে গেছে। কারণ সারা বিশ্বের মানুষ এখন পেট্রোলিয়াম জাতীয় প্রোডাক্টের ওপর নির্ভরশীল।রান্নার গ্যাস থেকে পরিবহন, সবকিছুতেই তেলের প্রয়োজন। এই যুদ্ধের ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে চলেছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্ববাজারের ২০ শতাংশ তেল পরিবহন করা হয়, যা ইরান বন্ধ করে দিয়েছে। গতমাসে ভারত যে বাস্কেট থেকে অপরিশোধিত তেল কেনে তার গড় দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৬৯ ডলার,তা এখন ১১৭ ডলার। ভারতে রান্নার গ্যাসের সমস্যা শুরু হয়ে গেছে।পেট্রল পাম্পগুলিতে গ্যাস নেওয়ার জন্য অটোর বিশাল লাইন এই প্রথম দেখতে পাচ্ছি।অটোর ভাড়া ইতিমধ্যেই বেড়ে গেছে কারণ এই গ্যাসের দাম কেজি প্রতি ১২ টাকা বেড়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রান্নার গ্যাসের দাম ৬০ টাকা বাড়ালেও পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়াতে সাহস পায় নি , তার কারণ আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। কিন্তু কতদিন ?

হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার ফলে এলএমনিতেই সারা বিশ্ব জ্বালানি সংকটে ভুগছে। তার ওপর কুয়েত,বাহারিন কাতার,সৌদি আরব,সংযুক্ত আরব আমিরসাহি সহ বিভিন্ন দেশগুলির তেলকেন্দ্রের ওপর ইরান হামলা চালালে এই সঙ্কট আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।ফলে আমেরিকা ও ইজরায়েল একঘরে হয়ে যাবে।বিশ্বের কোন দেশই তখন আমেরিকাকে নূণ্যতম মানবে না। তাই উক্ত দেশগুলি ট্রাম্পকে বাধ্য করছে ইজরায়েলকে নিরস্ত্র করতে। কাতারের তেলকেন্দ্রে হামলার ফলে তা সারাতে বছর পাঁচ সময় লাগবে। দেশের রপ্তানির একের ছয় ভাগ এই কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হত। ইতিমধ্যে ইরান ৪০০০ কিমি দূরের দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের সামরিক আওতার মধ্যে এক বিস্তৃত এলাকা রয়েছে। ইজরায়েলের ডিমোনা

শহরে একটি পরমাণুকেন্দ্রে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে ইরান। এটি ছিল ইজরায়েলের প্রধান পরমানু ঘাঁটি। এই শহরে প্রায় সাত হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূতেরা বাস করেন। এদিকে ট্রাম্প ২৪ ঘন্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার চরম বার্তা দিয়েছিলেন ইরানকে। ইরান বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল তাকে।এখন ট্রাম্প কি করে পশ্চাৎপসারণ করা যায় এই যুদ্ধ থেকে তা নিয়ে বিশেষ টেনসনে রয়েছেন। যুদ্ধের সময় মিথ্যার বান কোন নতুন ঘটনা নয়। কে যে সত্যি বলছে তা বিচার করা দুরূহ। সমাজমাধ্যমে ট্রাম্পের বক্তব্য ছিল যে আমেরিকান সেনা লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ইরানের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা কমিয়ে আনা ও মিত্র দেশগুলিকে রক্ষা করা। এটা মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। যুদ্ধ গুটিয়ে আনার এই মতলব যে জলে গিয়েছে তা ইরানের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নাকচ করে নিয়মিত পাল্টা আঘাত হানায় তা বোঝা যাচ্ছে। মরিয়া ইরান আমেরিকা ও ইজরায়েলের চরম ক্ষতি না করে ছাড়বে না বলেই মনে হয়। আবার ইরান প্রতিবেশী দেশগুলিকে মিত্রতার বার্তা দিয়ে বলেছে যে ইরান তাদের সাথে কোন সংঘাত চায় না যাতে জায়নবাদিদের লাভ হয়।

এদিকে পাকিস্তান এই যুদ্ধ থামাতে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসছে। তাতে ট্রাম্পের সম্মতি আছে বলেই মনে হয়। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের একটি পোস্ট শেয়ারের মাধ্যমে ট্রাম্প এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ট্রাম্পকে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ফোন অন্যদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানকে শরিফের ফোনালাপ এই ঘটনাকে বৈধতা দিয়েছে। এর ফলে ভারতের মুখ লুকানোর জায়গা থাকছে না। কূটনৈতিক পদক্ষেপের প্রশ্নে ভারতের বর্তমান শাসকের থেকে পাক প্রশাসন যে অনেকটা এগিয়ে গেছে তা পরিষ্কার। নমস্তে ট্রাম্প আর হাউডি মোদী যে জলে গেল তা কি বিজেপি সরকার বুঝতে পারছে? আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে হাত মেলানো,জড়িয়ে ধরে মিনমিন করে কোন সম্পর্ক তৈরী হয় না। চোখে চোখ রেখে কথা বলার মত সাহস লাগে। আর লাগে কূটনৈতিক বুদ্ধি। যা পন্ডিত নেহেরু থেকে ইন্দিরা গান্ধীর ছিল। এমনকি রাজীব গান্ধী থেকে মনমোহন সিং অব্দি যে সাহস দেখাতে পেরেছিলেন তা ৫৬ ইঞ্চি ছাতি দেখাতে পারছেন না তার কারণ মেরুদণ্ডের অভাব ও মিথ্যার বেসাতি করার অভ্যাস।

যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমেরিকা শর্ত দিয়েছে ঃ-

১) ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ শূন্য ও মজুত ইউরেনিয়াম তৃতীয়পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া

২) হরমুজ প্রণালীতে স্বাভাবিক পণ্য চলাচলের জন্য ব্যাবস্থা

৩) সব নিউক্লয়র সুবিধা বন্ধ করা

৪) আগামী পাঁচ বছর কোন মিসাইল পোগ্রামিং নয়

৫) ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি স্থগিত করতে হবে এবং আত্মরক্ষা ছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে

৬) হিজবুল্লা,হামাসের মত আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে সাহায্য বন্ধ করতে হবে।

তবেই আমেরিকা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আংশিক প্রত্যাহার করবে ও অন্যভাবে সহায়তা দেবে।

এবার দেখে নেওয়া যাক ইরান যুদ্ধবিরতির কি শর্ত দিয়েছে।

১) মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সব সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে

২) যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতিপূরণ

৩) আর্থিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

৪) হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ ও পন্যবাহী জাহাজের থেকে মাসুল আদায়ের ক্ষমতা

৫) হিজবুল্লার ওপর ইজরায়েলের আক্রমণ বন্ধ করা

৬) ভবিষ্যতে এই ধরণের আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি।

স্বাভাবিকভাবেই এই শর্তগুলি কোন পক্ষের কাছেই গ্রহনযোগ্য হবে না। তাই একথা বলে দেওয়া যায় যে এই যুদ্ধের ইতি ঘটার এখনই সম্ভাবনা নেই।

ভারতের অবস্থানটা কোথায় ?

আমেরিকা যখন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইকে তখন মোদী সরকারের ভূমিকা ভারতবাসী হিসাবে আমাদের লজ্জা দেয়। যে ভারত পঞ্চশীল বা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পুরোহিত সেই ভারত কিনা নিজের ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে আমেরিকার সামরিক অভিযানকে বৈধতা দিল ! মোদী ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন যে কোন সমস্যাই কেবল সামরিক সংঘাতের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। এই কেবল শব্দটির মাধ্যমে তিনি পক্ষান্তরে বুঝিয়ে দিলেন মার্কিন ইজরায়েল বাহিনী ইরান আক্রমণ করবে, সাধারণ মানুষকে খুন করবে আবার আলোচনায় বসবে। এই আগ্রাসনের নিন্দা না করে এটিকে একটি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া বলে সিলমোহর দিলেন মোদী। আমেরিকাকে কি আমরা চিনি না? ইরাক ও লিবিয়ায় একই যুক্তি আমেরিকা দিয়েছিল।এইভাবেই তারা সাদ্দাম হোসেন ও গদ্দাফিকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের সনদে আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনও কারণে সামরিক আক্রমণ নিষিদ্ধ। আমেরিকা প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করেছে ও তাদের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করেছে। সব অনুমান সঠিক ছিল কি? এই পুরোদস্তুর আগ্রাসন সমর্থন করে ভারত দীর্ঘদিনের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির আদর্শ ও অবস্থান থেকে সরে গেল।

একসময় ছিল যখনই কোনও রাষ্ট্রের অখন্ডতা লঙ্ঘন হত তখন ভারত সরব হত। ইউক্রেনের বিষয়ে এত কথা আর ইরানের ব্যাপারে ভারত তার মেরুদণ্ড বিসর্জন দিয়ে গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব দেওয়ার নৈতিক অধিকারটিও বিসর্জন দিয়েছে।মানবতার ইতিহাসে কলঙ্ক লেপনকারী ইজরায়েলের মত ঘাতকবাহিনীর হাত শক্ত করেছে।

এই ইজরায়েল গত কয়েক বছরে প্রায় সত্তর হাজার নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে প্যালেস্টাইনে। তাদের নির্লজ্জ চামচাগিরির পেছনে আছে এক আদর্শগত মিল। আরএসএস ও বিজেপির হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নের সঙ্গে জায়নবাদীদের ইহুদি রাষ্ট্র এই দুই দর্শনের মধ্যে দেখা যায় এক উগ্র জাতীয়বাদ ও ধর্মীয় আধিপত্যবাদের মিল।সাভারকর ছিলেন এই জায়নবাদীদের পক্ষে।এরা দুজনেই ইসলামকে মূল শত্রু হিসাবে দেখে। যেকারণে পাকিস্তানের মধ্যস্ততা ইজরায়েল ভাল চোখে দেখছে না। ইরানের মত দীর্ঘকালের বন্ধুকে তাই এই সরকার নিছক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে দেখছে যা আমাদের স্বার্থ ও বৈদেশিক নীতি হিসাবে বিপদজনক। আবার তেল ও গ্যাসের জন্য ইরানকে তেল মারা কোন বিদেশনীতি? তাই এখনই ভারতকে মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াতে হবে নাহলে ভারত পশ্চিম এশিয়া যে প্রভাব বিগত সত্তর বছর ধরে অর্জন করেছে তা মুছে যাবে।সাম্রাজ্যবাদের লেজুরবৃত্তি করে ভারত কি পারবে বিশ্বগুরুর তকমা বজায় রাখতে? পররাষ্ট্রনীতি যখন দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক দেউলিয়ার পথে ঠেলে দেয় তখন কি তাকে কূটনৈতিক জয় বলা যায়। ভারত বহুমেরুর বিশ্বের কথা বলে ব্রিকসের সদস্য হিসাবে। কিন্তু বিশেষ সংকট যখন দরজার সামনে তখন সব নীতি আদর্শ জলান্‌জলি দিয়ে আমেরিকার চাকর হয়ে যায় এই মেরুদণ্ডহীন বিজেপি সরকার। এই দ্বিচারিতাই আমরা এখন দেখছি।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না

সৌর বসু

পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইল,ইরান যুদ্ধ তিন সপ্তাহ অতিক্রম করেছে। ইতিমধ্যে এই যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার উপসাগরীয় দেশগুলি;সৌদি আরব, কুয়েত, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, বাহারাইন ও ওমান;সংঘাতের প্রভাবের মধ্যে পড়েছে।

এই যুদ্ধের ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশ। ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় জ্বালানি পরিবহনকারী বহু জাহাজ আটকা পড়েছে। ভারতের অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং এলপিজি গ্যাসের প্রায় ৮৫ শতাংশ এই প্রণালী দিয়ে আসে। ফলে জ্বালানি ও ইউরিয়ার সংকট দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ কতদিন চলবে তার ওপর পরিস্থিতির অনেকটাই নির্ভর করছে। ভারতের প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাংক গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতে, এই সংঘাতের ফলে মোট উৎপাদনের প্রায় ২০ শতাংশ জ্বালানি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। ইউরিয়ার মূল্য দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জ্বালানির মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি ১৭ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে জ্বালানি সংকটের প্রভাব ভারতের বিভিন্ন খাবারের দোকানেও পড়েছে। কোথাও কোথাও জ্বালানির অভাবে দোকান বন্ধ হয়েছে, আবার অনেক জায়গায় খাবারের মেনু সংকুচিত হয়েছে। এলপিজি গ্যাসের দোকানে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এলপিজি সংকট নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

এদিকে যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। ইরানের বক্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল হামলা শুরু করেছে, তাই যুদ্ধ বন্ধ করার দায়িত্ব তাদেরই। আত্মরক্ষার স্বার্থে ইরান পারস্য উপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে সৌদি আরব, কুয়েত, ইউএই প্রভৃতি উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিও উদ্বেগের মধ্যে পড়েছে, কারণ তারা নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল।

পারস্য উপসাগরের আরব রাষ্ট্রগুলি মূলত ইসলামী রাজতন্ত্র এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি)-এর সদস্য। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এদের অনেকেই ব্রিটিশ আশ্রিত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বাহারাইন ও কুয়েতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে নির্বাচিত সংসদ রয়েছে। অন্যদিকে সৌদি আরবে নির্বাচিত আইনসভা নেই। কাতারে নির্বাচনের মাধ্যমে সুরা পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরে তা স্থগিত হয় এবং বর্তমানে আমিরের দ্বারা সদস্য মনোনীত করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাহারাইন, সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারে তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়। বিশেষত ১৯৩৮ সালে সৌদি

আরবে বাণিজ্যিকভাবে তেল আবিষ্কারের পর উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ক্রমবর্ধমান তেলের চাহিদা পূরণের জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তেলের বিনিময়ে নিরাপত্তা সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সামরিক পদক্ষেপের ফলে ইরান পাল্টা হামলা চালাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে কাতার, বাহারাইন, ওমান, সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় অঞ্চলে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতি ও নিরাপত্তা আরও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। যদিও প্রকাশ্যে তারা কঠোর মন্তব্য করছে না, তবে অস্বস্তি স্পষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর কিছুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইসরাইল সফর করেন। ইজরায়েলের knesset এ (সংসদ) তিনি হামাসের হামলায় নিহত ইসরায়েলি নাগরিকদের প্রতি সমবেদনা জানান। সমালোচকদের মতে, একই সঙ্গে ৭০ হাজার ফিলিস্তিনিদের নির্মমভাবে হত্যার ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন। ফলে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

চীনের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভিন্ন। হরমুজ প্রণালী দিয়ে চীনের জন্যও বিপুল তেল সরবরাহ হয়। প্রণালী বন্ধ হওয়ায় চীনও ক্ষতিগ্রস্ত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ইরানের আক্রমণের নিন্দা জানানো হলেও চীন ভোটদানে বিরত থাকে এবং একই সঙ্গে অনুমোদন ছাড়া ইরানের ওপর হামলার সমালোচনা করে। চীন উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির উদ্বেগকেও সমর্থন জানায় এবং প্রস্তাবটিকে একপেশে বলে উল্লেখ করে।

ভারত প্রস্তাবটির সহ উদ্যোক্তা কিন্তু সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল কর্তৃক ইরানে আক্রমণের কথা স্থান পায়নি।

হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দ্রুত বাড়ছে এবং ব্যারেলপ্রতি মূল্য ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ন্যাটো দেশগুলির সহায়তা চেয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেবেছিল তীব্র সামরিক চাপের মুখে ইরান দ্রুত নতি স্বীকার করবে। কিন্তু তা ঘটেনি; বরং ইরান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং নিজেদের শর্তে যুদ্ধবিরতির কথা বলছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এটা নীতিগত পরাজয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন।

সামরিক ও কূটনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি অনিশ্চিত রয়ে গেছে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে জ্বালানি বাজার, খাদ্য সরবরাহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে এর প্রভাব গভীর হতে পারে।

একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি চেয়ে মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব

শুভাশিস মজুমদার

মার্কিন কংগ্রেস সদস্য গ্রেগ ল্যান্ডসম্যান মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর সংঘটিত নৃশংসতাকে 'যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ওহাইও থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সদস্য ল্যান্ডসম্যান ২০ মার্চ মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে এই প্রস্তাবটি পেশ করেন এবং পরবর্তীতে এটি পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটিতে পাঠানো হয়।

এর আগেও অক্টোবর,২০২২ এ, দুই প্রভাবশালী মার্কিন আইনপ্রণেতা প্রতিনিধি পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, যা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক জাতিগত বাঙালি ও হিন্দুদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানায়।

এই দুই সদস্যের এক জন ছিলেন ডেমোক্র্যাট দলের ভারতীয়-আমেরিকান কংগ্রেসম্যান আর ও খান্না এবং দ্বিতীয় জন রিপাবলিকান দলের স্টিভ চ্যাবট। তাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন তারা ওই গণহত্যার ঘটনায় নিজেদের ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সেই সময়ে রিপাবলিকান দলের সদস্য চ্যাবট এক টুইট বার্তায় বলেন, 'লাখ লাখ মানুষকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সময়ের আবর্তে সেই স্মৃতিকে আমরা কখনোই মুছে যেতে দিতে পারি না। এই গণহত্যাকে স্বীকৃতি প্রদান ঐতিহাসিক নথিপত্রকে আরও সুদৃঢ় করবে, আমাদের সহ-নাগরিক আমেরিকানদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা যাবে এবং সম্ভাব্য অপরাধীদের এই বার্তা দেয়া যাবে যে;এ ধরনের অপরাধ কখনোই সহ্য করা হবে না কিংবা বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।'

সাম্প্রতিকতম প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করে এবং তাদের সামরিক বাহিনী;জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত উগ্রবাদী ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সহযোগিতায়;সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক একটি সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে, যার আওতায় বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের ইশতেহার নিয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তৎকালীন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে সরকার গঠনের আলোচনা ব্যর্থ হয়।

এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ওয়াশিংটনে 'সিলেক্টিভ জেনোসাইড' (বাছাইকৃত গণহত্যা) শিরোনামে একটি তারবার্তা পাঠান; সেখানে তিনি লেখেন, ত.....তাছাড়া, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় অবাঙালি মুসলমানরা সুপরিকল্পিতভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসতিগুলোতে হামলা চালাচ্ছে এবং বাঙালি ও হিন্দুদের হত্যা করছে।'

ল্যান্ডসম্যান উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল কনসাল জেনারেল ব্লাড এই সংঘাতের বিষয়ে মার্কিন সরকারের আনুষ্ঠানিক নীরবতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন; ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটের ২০ জন সদস্য এতে স্বাক্ষর করেছিলেন। যা পরবর্তীতে 'ব্লাড টেলিগ্রাম' নামে পরিচিতি লাভ করে। ওই বার্তায় বলা হয়, 'দুর্ভাগ্যবশত যেখানে জেনোসাইড বা গণহত্যা শব্দ প্রযোজ্য, সেই তআওয়ামীদ সংঘাতকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে গণ্য করে আমরা নৈতিকভাবেও হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাধারণ মার্কিনীরা এ নিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন' এবং ব্লাড নিজেও এই আপত্তির সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

৮ এপ্রিল কনসাল জেনারেল ব্লাড আরেকটি টেলিগ্রাম পাঠান। সেখানে উল্লেখ করা হয়, 'হিন্দুদের ওপর যে নগ্ন, পরিকল্পিত ও ব্যাপক দমন,পীড়ন চালানো হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে ত্গণহত্যাদ শব্দটি পুরোপুরি প্রযোজ্য...'।

প্রস্তাবটিতে তবলা হয়েছে যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের ইসলামপন্থী মিত্ররা ধর্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে জাতিগত বাঙালিদের নির্বিচারে গণহত্যা করেছে; তাদের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের হত্যা করেছে; এবং হাজার হাজার নারীকে জোরপূর্বক তাদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করেছে।দ

এতে আরও বলা হয়েছে, 'তারা বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল এবং গণহত্যা, দলবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্মান্তর ও জোরপূর্বক বিতাড়নের মাধ্যমে তাদের নির্মূল করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল।'

কোনো নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য সমগ্র জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায় দায়ী হতে পারে না;এই বিষয়টি উল্লেখ করে প্রস্তাবটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের মিত্র জামায়াতে ইসলামীর দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতাকে 'মানবতাবিরোধী অপরাধ', 'যুদ্ধাপরাধ' এবং 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ওই সময় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন দেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর সেই যুদ্ধ শেষ হয়। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের।

১৬ই ডিসেম্বর ২০১৪, দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকার এক নিবন্ধে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডিওর পাশাপাশি সংবাদপত্র গুলি সেন্সরশিপ উপেক্ষা করে উপযুক্ত তথ্য ছাপিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রসঙ্গে ডেইলি স্টার উল্লেখ করেছে অ্যান্টনি মাসকারেনহাসের নাম। সবথেকে আশ্চর্যের কথা হলো এই মাসকারেনহাস একজন পাকিস্তানি, যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত বর্বরতার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। জেনোসাইড বা গণহত্যা শিরোনামে একের পর এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন ইংল্যান্ডের সানডে টাইমস পত্রিকায়।

ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সানডে টাইমস এর সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্স কে জানিয়েছিলেন মাসকারেনহাসের সংবাদ নিবন্ধগুলি তাঁকে এতটাই গভীরভাবে যন্ত্রণা এনে দিয়েছিল যে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ইউরোপীয় রাজধানী এবং মস্কোতে কূটনৈতিক প্রচার এবং আলোচনা করেছিলেন।

বাংলাদেশে, জাতীয় সংসদে ২০১৭ সালের ১১ মার্চ, ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর ২০ মার্চ তখনকার আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভা ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ওই

বছরেই ২৫ মার্চ প্রথম ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি পালন করা হয়। রাত ১০টা ৩০ মিনিট থেকে ১০টা ৩১ মিনিট পর্যন্ত সারা দেশে প্রতীকী 'ব্ল্যাক-আউট' পালন করা হয়েছিল এবং তা' প্রতি বছর পালিত হত। এই বছর পূর্ব ঘোষণা সত্বেও কোনো অজ্ঞাত কারণে এই প্রতীকী ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ

৭ই মার্চের ঢাকা ও শেখ মুজিব

শুভ বসু

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ছিল ঢাকার এক রৌদ্রোজ্জ্বল, আর্দ্র বিকেল। সাধারণত বছরের এই সময়ে মানুষ রাস্তায় বের হওয়া এড়িয়ে চলে। তবুও সেদিন প্রখর সূর্যের নিচে লক্ষ লক্ষ মানুষ শেখ মুজিবের কথা শুনতে সমবেত হয়েছিল। যখন তিনি ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!', তখন তুমুল করতালির ঝড় উঠল। পূর্ব পাকিস্তানে সেই মহাক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার তাদের সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল। সেদিন শেখ মুজিবের ভাষণ লক্ষ লক্ষ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি ছিলেন বাগ্মী কিন্তু সুনির্দিষ্ট, নিজের দাবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কিন্তু অনমনীয় নন। তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অহিংস সংগ্রামের ডাক দেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণটি প্রদান করেন, যা জনস্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

শেখ মুজিব ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির এক বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং বর্তমান বাংলাদেশেও তিনি কিংবদন্তি হয়ে আছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি বিভিন্ন সময়কালের সাক্ষী ছিলেন: ঔপনিবেশিক যুগে একজন ছাত্রকর্মী হিসেবে, পাকিস্তান যুগে একজন ভিন্নমতাবলম্বী গণতন্ত্রপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে দেশের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বাঙালি স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের স্বর্ণযুগে তাঁর দীর্ঘকায় চেহারা, প্রগাঢ় কণ্ঠস্বর এবং উদাত্ত বাগ্মিতা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। পাকিস্তানের প্রথম দুর্ধর্ষ সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা গণঅভ্যুত্থানের পরপরই, ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭০ সালে, স্বাধীনতার ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে, শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনপন্থী বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের দুটি আসন বাদে বাকি সব আসন দখল করে। দলটি পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত জাতীয় আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সামরিক প্রশাসন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ, সামরিক বাহিনী শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ওপর কঠোর দমন-পীড়ন চালায়। ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে, শেখ মুজিবের অনুপস্থিত-উপস্থিতি ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে নয় মাস একুশ দিনব্যাপী দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের পর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৭২ সালে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফিরে শেখ মুজিব বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার অবসানের জন্য আলোচনার চেষ্টা করেন, ভারতকে তার সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও চলমান অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও তিনি একটি সংবিধান প্রণয়নে সহায়তা করেন এবং সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন। অবশেষে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে। যদিও অনেকে দাবি করেন যে নির্বাচনটি রাজনৈতিক জবরদস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না, শেখ মুজিব তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানেও হয়তো নির্বাচনে জয়ী হতে পারতেন।

তবুও নির্বাচনের পরপরই, গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র অরাষ্ট্রীয় শক্তিগুলোর অবাধ বিচরণের মধ্যে অতিমাত্রায় সক্রিয় একটি দেশকে স্থিতিশীল করার কঠিন দায়িত্ব তাঁর সামনে আসে। তাঁকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির অর্থনীতিকেও পুনরুজ্জীবিত করতে হয়েছিল। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর আরব তেল নিষেধাজ্ঞার কারণে সৃষ্ট আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি তার কাজকে আরও জটিল করে তুলেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মজুতদারি ও কালোবাজারি, যাতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অংশ নিয়েছিলেন। অর্থনীতির অদক্ষ পরিচালনা সংকট ও দুর্ভিক্ষকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আন্তর্জাতিকভাবে শেখ মুজিবের শাসনকাল একঘরে হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৪ সালের সংকটময় মাসগুলোতে মার্কিন ফোর্ড প্রশাসনের ২০,০০০ টন খাদ্য সহায়তা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিউবায় পাটের বস্তা রপ্তানির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার

প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই অব্যাহত অর্থনৈতিক সংকট তার জনপ্রিয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল।

তবুও দেশে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে তাঁর অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি এবং শীতল যুদ্ধ যুগে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা;এসব কারণে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের তুলনা করা যায় কোয়ামে নক্রুমার সঙ্গে, যিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা এবং নিজের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনেছিলেন, কিন্তু সামরিক বাহিনী দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। একই ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ক্যারিশম্যাটিক রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ, যিনিও তাঁর দেশের স্বাধীনতায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং রাজনৈতিক গণহত্যার মধ্যে সামরিক জেনারেলদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি কি আহমেদ বেন বেলার মতো ছিলেন, সেই আলজেরীয় দেশপ্রেমিক যিনি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে উপস্থিত না থাকলেও জনপ্রিয় ছিলেন এবং স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, তারপর একটি সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন? তিনি কি পেরোনের মতো ছিলেন, সেই বিখ্যাত আর্জেন্টিনীয় নেতা যিনি সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শ্রেণি বৈষম্যের পরিস্থিতিতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? তিনি কি আলেন্দের মতো ছিলেন, চিলির সেই মার্ক্সবাদী নেতা যিনি শেখ মুজিবের কিছুকাল আগে একটি সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন?

এই নেতাদের অনেকের সাথেই শেখ মুজিবের অনেক মিল রয়েছে। তাঁদের ক্ষমতায় আরোহণ, তাঁদের বামপন্থী এবং জাতীয় মুক্তির জন্য তাঁদের অবিচল সাধনা;সবই ছিল শেখ মুজিবের কার্যপদ্ধতি ও জাতীয় মুক্তির অন্বেষণের অনুরূপ। এই নেতাদের মতোই শেখ মুজিবও জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা থেকে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন এবং ক্ষমতার জাঁকজমক থাকা সত্ত্বেও জীবনের শেষ বছরগুলিতে সেই জনগণের কাছ থেকেই ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বিষয়টি অনুভব করেছিলেন। অনেকের মতোই, তিনিও সেনা কর্মকর্তাদের কাছে অপছন্দের পাত্র ছিলেন, যারা বেসামরিক শাসন সহ্য করতে পারতেন না এবং দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন। এই সমস্ত পুরুষ রাষ্ট্রনায়কদের মতোই, তিনিও একজন জনতুষ্টিবাদী পিতৃপুরুষের ভূমিকা পালন করতেন, যিনি নিজেকে 'জাতির' পিতা হিসেবে গণ্য করতেন। তবুও এই ধরনের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, আলেন্দে ছাড়া তাঁদের কেউই তাঁদের সমগ্র পরিবারের এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসের সম্মুখীন হননি।

(খুব শীঘ্রই আসছে আমার বই শেখ মুজিব: স্বাধীনতার অনুসন্ধান। বইটি ইংরেজিতে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হবে। বইটি পড়বেন, সমালোচনা করবেন শেখ মুজিব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হবেন ।শেখ সাহেবের জন্মদিনে আমার এটাই শ্রদ্ধার্ঘ্য ।)

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক সমাবেশ ও বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ এ ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ১০ লাখ। আর ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে রেসকোর্সে আসা মানুষের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২০ লাখ। যা আজকের সময়ে এসে কতো হতে পারে? বর্তমানে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা আড়াই কোটির বেশী। .এখন সবচেয়ে কাছে ধরা যাক, ২ ঘণ্টায় কুমিল্লায় যাওয়া যায়। আর তখন কুমিল্লার লোকের ঢাকা আসতে হলেও তিনবার ফেরী ভাঙতে হতো। উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকায় আসতে কম করে হলেও দেড় দিন সময় লাগতো। দক্ষিণবঙ্গে যাতায়াতের জন্য কাঠের লঞ্চ আর রকেট ছাড়া গতি ছিলোনা। এই তো সাত-আট বছর আগেও রকেটে চেপে ঢাকা থেকে খুলনায় যেতে আমার ২৬ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। .মানুষ এই জনসভা নিয়ে কতোটা উৎফুল্ল ছিল, তা টের পেয়েছিলাম জহুরুল হক মুন্সী বীর প্রতীক (বার) এর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে। ৭ই মার্চের সমাবেশে যে প্রত্যেকের হাতে যে এতো বাঁশের লাঠি দেখা যায়, তার একাংশ কেটে আনা হয়েছিলো ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় থেকে। মুন্সিই সেই বাঁশ ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন।

.একাত্তরের মার্চ মাসে জহুরুল হক মুন্সী ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের ট্রেড ইউনিয়নের সহসভাপতি। তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল জামালপুর জেলার সীমান্তবর্তী বক্সিগঞ্জের একটা ইউনিয়নে। তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু যখন ৭ তারিখ রেসকোর্সে সমাবেশ হবে ঘোষণা দিলেন, তখন আমরা গারো পাহাড় থেকে নৌকা ও ট্রেনের ছাদে করে ঢাকা শহরে ও নারায়ণগঞ্জে সাধারণ মানুষদের জন্য বাঁশ সাপ্লাই দিয়েছিলাম। সেই বাঁশ বাহাদুরাবাদ ঘাট ও দেওয়ানগঞ্জ থেকে ট্রেনে তোলা হতো। পরে সেই বাঁশ কেটে লাঠি বানানো হয়েছিলো।'

.মানুষ তখন ঢাকায় আসার কথা চিন্তা করতো চূড়ান্ত কিছু পাওয়ার আশাতেই। আর তার প্রমাণ এই ভাষণ।

কবি আল মাহমুদ যথার্থই লিখেছিলেন,

.'সে যখন বলল, 'ভাইসব।'

অমনি অরণ্যের এলোমেলো গাছেরাও সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল
সে যখন ডাকলো, 'ভাইয়েরা আমার।'
ভেঙ্গে যাওয়া পাখির ঝাঁক ভিড় করে নেমে এল পৃথিবীর ডাঙায়
কবিরা কলম ও বন্দুকের পার্থক্য ভুলে হাঁটতে লাগলো
খোলা ময়দানে।' *(fb থেকে সংগৃহীত)*

দেশের খবর

লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি ও ভোটাধিকার হরণ

সুকুমার মিত্র

গণতন্ত্রের হৃদয় ভোটাধিকার। কিন্তু ২০২৫-এর ডিসেম্বর পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে এই অধিকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' নামক রাষ্ট্রীয় হিংস্রতার ছায়া। নির্বাচন কমিশনের নিম্নস্তরীয় কর্মীরা নিয়ম মেনে উত্তর দিলেও, উর্ধ্বতন নির্দেশে কারণহীন সংশয় তৈরি হয়েছে। ফলে মুসলিম, কতজন দলিত মহিলা, নতুন প্রজন্মের ভোটারদের ভোটাধিকার নিয়ে হিসাবনিকাশ শুরু;কতজন বঞ্চিত হবে, কোন দল লাভবান হবে। এই 'রাষ্ট্রীয় গণিত' গণতন্ত্রকে ধীরে ধীরে হত্যা করছে, ধর্মীয় বিভাজনকে রাজনৈতিক অস্ত্র বানাচ্ছে। এই সংকট শুধু সংখ্যালঘুর বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর নয়, সমগ্র গণতন্ত্রের।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি ভোটাধিকার অথচ অবান্তর যৌক্তিক অসঙ্গতি প্রসঙ্গ আমদানি করে গণতন্ত্রের পথকে সংকুচিত করা হচ্ছে। কোনও এক গোষ্ঠীর মগজে লালিত অসঙ্গতিগুলি প্রকাশ্যে এসে সাংবিধানিক মোড়কে গণতন্ত্রকে পঙ্গু করে, জন্ম দিয়েছে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের।

নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম মেনে উত্তর দিলেও, উপরের স্তর থেকে কোনও কারণ না দেখিয়ে ভোটাধিকার নিয়ে সংশয় রেখে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে হিসাবনিকাশ;কত মুসলমান , কত মহিলা , কত দলিত ,কত পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষ ভোট দিতে পারবেন না ।আর তার ফলে কতটা লাভবান হবে সেই দল যারা সংখ্যালঘু , মহিলা ও দলিত বিরোধী । হিসাবনিকাশই আসলে গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ ভোটাধিকার নিয়ে সংশয় তৈরি হলে তা শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আঘাত নয়, বরং সমগ্র গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর আঘাত। আর বিচারাধীন ভোটাররা শেষ পর্যন্ত বিচার, ট্রাইবুনাল পেরিয়ে কতটা ভোটের দিন ই.ভি.এম-এর কাছে পৌঁছতে পারবেন ? মজা হল সেই দায় এখন দেশের শীর্ষ আদালতের । বাকি সব নির্বাচনী বিধি, আচরণ বিধি দফায় দফায় পর্যবেক্ষণ দেশের ভোটারদের জন্য না, ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সাংবিধানিক দায় তা অদূর ভবিষ্যৎ-ই বলবে।

'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' নামক এই নতুন রাষ্ট্রীয় হিংস্রতা আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার তৈরি করা এক হাতিয়ার। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ভোটাধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, অথচ কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ দেখায় না। ফলে নাগরিকরা আইনি পথে লড়াই করলেও, বাস্তবে তাঁদের অধিকার ঝুলে রয়েছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই পরিস্থিতি গণতন্ত্রকে দুর্বল করে, আর সমাজে বিভাজনকে আরও গভীর করে তুলবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণেও বারবার উঠে এসেছে, ভোটাধিকার সংকট গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই সংকট আরও ভয়াবহ, কারণ এখানে ধর্মীয় বিভাজনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুসলিম ভোটারদের ভোটাধিকার নিয়ে সংশয় তৈরি করে আসলে রাজনৈতিক লাভের হিসাব কষা হচ্ছে।

যৌক্তিক অসঙ্গতি আসলে যুক্তিসঙ্গত এক ধরনের রাষ্ট্রীয় 'গণিত'। যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারকে সংখ্যার খেলায় পরিণত করা হচ্ছে। কতজন ভোট দিতে পারবে না, তার ভিত্তিতে কোন দল এগোবে বা পিছোবে;এই অঙ্কই এখন রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। অথচ গণতন্ত্রে ভোটাধিকার কোনও অঙ্ক নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সে তো সংবিধানের দুই মলাটের মধ্যে বন্দী।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর পথ ছিল প্রথমত, নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। ভোটাধিকার নিয়ে কোনও সংশয় থাকলে তা দ্রুত সমাধান করা। দ্বিতীয়ত, আদালতকে আরও দ্রুততার সাথে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া। ভোটাধিকার সংকটকে শুধু প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে না দেখে, গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখতে হবে। তৃতীয়ত, নাগরিক সমাজকে আরও সরব হতে হবে। কারণ ভোটাধিকার সংকট শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র গণতন্ত্রের সমস্যা। পরিশেষে বলা যায়, ভোটাধিকার কোনো গাণিতিক সমীকরণ নয়, বরং গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। যৌক্তিক অসঙ্গতির নামে নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া প্রকারান্তরে সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর এক পরিকল্পিত আঘাত। যখন নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়

এবং বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ভোটারকে ইভিএম থেকে দূরে রাখে, তখন গণতন্ত্রের পরাজয় ঘটে। এই সংকট কেবল কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয়, বরং সমগ্র জাতির। তাই রাষ্ট্রীয় এই 'গাণিতিক সন্ত্রাস' রুখতে বিচার বিভাগ, কমিশন এবং নাগরিক সমাজকে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সক্রিয় হতে হবে; অন্যথায় সুস্থ গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

এই সংকটময় মহুর্তে মনে পড়ে ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে প্রথমবার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করাকে পশ্চিমা অনেক পণ্ডিত ক্ষ্মজুয়া খেলাক্ষ্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। সুকুমার সেন তখন দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন যে, সঠিক প্রশাসনিক কাঠামো এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকলে গণতন্ত্রের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সফল হওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, বাঙালি ওই সন্তানের হাত ধরে স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন সমকালীন দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই দুনিয়াই আমাদের পরিণত সংসদীয় গণতন্ত্রের ৭৫ বছরে এসে কেমন সংকীর্ণ কাণাগলির সন্ধানে ঘুরপাক খাচ্ছে। গণতন্ত্রের নীরব রক্তক্ষরণ হচ্ছে সেই ভারতেই।

নতুন পরিস্থিতিতে অসমের বিধানসভা নির্বাচন এবং বিরোধী ঐক্য

কমলেশ গুপ্ত

আগামী ৯ এপ্রিল অসম বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে।মোট ১২৬ টি সমষ্টিতে এক দফায় ভোট। মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১৫। রাজ্যের মোট ভোটারের সংখ্যা ২.৫০ কোটি।

ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার সাথে রাজ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নটা উঠে এসেছিল তা হচ্ছে -- ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তি একত্রিত হয়ে বিজেপির বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে পারবে কি না ? অতীতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে বিভক্ত বিরোধীরা শাসক দলকে লাভবান করে। তাই আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ভোট যাতে ভাগ না হয়,তার জন্য কার্যকর নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তোলা ছিলো এই সময়ের দাবি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে এই প্রসঙ্গে ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।বিরোধী ঐক্যের পক্ষে জনমতও ৪ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্যের প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়েছে। সার্বিক ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হয়েছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেস এবং অখিল গগৈর রাইজর দলের মধ্যে গ্ধআসন ভাগের প্রশ্নে বিরোধের মিমাংসা হয়েছে। ঐক্যের প্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। আসন সমঝোতা চূড়ান্ত হয়েছে। ফলে এবারের লড়াই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এর মধ্যেই সীমিত থাকবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব দলের অবস্থান এবং মতাদর্শের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু বিজেপির সাম্প্রদায়িক এবং স্বৈরতান্ত্রিক কু শাসন উৎখাত করার স্বার্থে বিজেপি বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বাস্তববাদী নির্বাচনী কৌশল তথা আসন সমঝোতা অতি প্রয়োজনীয়।বলা বাহুল্য যে বিরোধী শক্তি বিভক্ত হয়ে থাকলে, জনতার ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ অসন্তোষের পরেও শাসক দল পুনর ক্ষমতা দখলের সুযোগ পাবে। এমতাবস্থায় বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরভোগ - ভবানীপুর থেকে এই প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে গত ২৫ মার্চ এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চলছে।

একই সাথে এটাও লক্ষ্যনীয় যে এন ডি এ জোটের আসন ভাগাভাগির নিয়ে যে সমস্যা ছিল, শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। জোটসঙ্গী অগপ পেয়েছে ২৬টি ব আসন । তাঁর পরও অনেককটি আসনে তারা 'বন্ধুত্ব পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' নামবে বলে জানিয়েছে। বড়ো সংগঠন ইউ পি পি এল এবার এন ডি এ জোটে থাকবে না বলে ঘোষণা করেছে এবং নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে আলাদা লড়ছে। তার পরিবর্তে বড়ো ল্যান্ডে এবার বিজেপির সঙ্গী হয়েছে হাগ্রামা মহিলারির বি পি এল দল। তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১১ জন প্রার্থী দিচ্ছে ।বিজেপি দলের অফিসিয়াল প্রার্থী ৮৯ জন। কিন্তু অন্তঃদলীয় কলহ এবং বিদ্রোহী প্রার্থীদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে নেতারা। প্রাক্তন কংগ্রেসীদের আধিপত্যে বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকে বেসামাল হয়ে পড়েছে বিজেপি। বৃহৎ পরিমাণের টাকার আকর্ষণ, লোকসভার প্রার্থী করার আশ্বাস এবং সরকারি পদবীর প্রলোভন উপেক্ষা করে বেশ কয়কজন নির্দলীয় হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। সাথে যুক্ত হয়েছে পূরোনো আর নতুন বিজেপির সংঘাত।উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি তথা বিদ্রোহ দমনে নেমেছে একাংশ অনুগত। কিন্তু এই 'ব্যতিক্রমী' রাজনৈতিক দলের অনুশাসন, অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেছে কই ?একই চিত্র বরাক উপত্যকাতেও। আর এস এসের সক্রিয়তা অবস্থা কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যা লক্ষ্যনীয় হবে।

বিগত বেশ কিছু নির্বাচনের মতো এবারও নির্বাচনের মূল ইস্যু হয়ে উঠেছে রাজ্যর ছয় জনগোষ্ঠীর তফশিল ভুক্ত করা, বন্যা এবং নদী ভাঙ্গনের গুরুতর সমস্যার স্থায়ী সমাধান, তীব্র বেকার সমস্যার সমাধান, মূল্যবৃদ্ধি , বিদেশী সমস্যার স্থায়ী সমাধান,অসম চুক্তির প্রতিটি দফার রূপায়ণ,আন্তঃরাজ্যিক সীমা সমস্যার সমাধান, চাষের একশ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত অসম এই মূল দশটি জ্বলন্ত সমস্যা। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যার সমাধান প্রতিশ্রুতি শাসক এবং বিরোধী পক্ষ উভয়ের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া হয়েছে।কিন্তু সমাধান হয়নি। এছাড়াও অবিরত বিদ্যুৎ যোগান,এন আর সি আপডেট করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা,সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মহিলার আসন সংরক্ষণ, সকলের জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় গুলো ইশতেহারেই সীমাবদ্ধ থাকে। কোনো দিনই বাস্তবায়ন হয়না। বিগত দশটি নির্বাচনের মত এবারও ইস্যু হয়েছে ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তারসাথে বিজেপি হিন্দুত্ব, পাকিস্তানের এজেন্ট, ঘুছপেটি (অনুপ্রবেশকারি) ইত্যাদি কার্ড খেলার চেষ্টা করেছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের গত কয়েক বছর ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি আর জনগণের সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন। কর্পোরেট গোষ্ঠীর সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে রাজ্যের মানুষ ক্ষুব্ধ। দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগণকে দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়ে নির্মম উচ্ছেদ অভিযান, সরকারের জনবিরোধী নীতির সমালোচনা যারাই করে তাদের ওপর প্রশাসনিক ভীতি প্রদর্শন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার দমনের প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিজেপি শাসনের কর্তৃত্ববাদী কুশাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বহু ভাষিক,বহু জাতিক এবং বহু সাংস্কৃতিক রাজ্য এই অসমে এমন বিভাজনের রাজনীতি জনগণের সৌহার্দ্য এবং শান্তি -সম্প্রীতির জন্যে বিপদজনক।

অন্যদিকে রাজ্যে অতি দ্রুত আর এস এসের আদর্শগত কর্মসূচি রূপায়ণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।'এক দেশ এক সংস্কৃতি,এক ভাষা,এক জাতির তত্ত্ব অসমের বিভিন্ন জাতি- জনগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং অস্তিত্ব বিপন্ন করছে। একদিকে সাম্প্রদায়িক এবং সংবিধান বিরোধী সি এ এ প্রণয়ন এবং চালু করে অসমের জনগণের আশংকা বৃদ্ধি করছে, অসমের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে বিপদ ডেকে এনেছে।ধ্ব অন্যদিকে এন আর সি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে লাটে তুলে বিদেশী নাগরিক সনাক্ত করার বিষয়টি জিইয়ে রাখা হয়েছে। অসংখ্য ভারতীয় নাগরিকে 'সন্দেহ যুক্ত' ঘোষণা করে নানা ধরনের হয়রানি করা হচ্ছে।

উন্নয়নের নামে বিজেপি সরকার কর্পোরেট গোষ্ঠী এবং বাইরের বণিকদের স্বার্থ পূরণ করছে।আদানি-আম্বানি-রামদেবদের মতো বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য বিশাল পরিমাণের জমি আবন্টন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উন্মুক্ত করার ফলে অসমের সম্পদ লুণ্ঠন হচ্ছে আর পরিবেশের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এদিকে জনসাধারণের মূল সমস্যা গুলো যেমন লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান, অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি, কৃষি এবং কৃষকের দুর্দশা, স্বাস্থ্য আর শিক্ষা জগতের সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে।এই মৌলিক সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সরকার কেবল নানা ধরনের প্রকল্প এবং ভাতা ঘোষণা করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলো দরিদ্র জনগণকে সাময়িক উপশম দিলেও স্থায়ী জীবিকার বিকল্প হতে পারে না। জীবন জীবিকার তাড়নায় ভোগা গরীব মানুষকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করাটা সরকারের কৃপা নয়, দায়িত্ব। একই সঙ্গে উৎপাদনশীল কাজে সরকার ব্যয় বৃদ্ধি না করে কেবল প্রকল্পের আওতায় আনা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়েছে। ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার এবছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে ঋণ নিয়েছে ৮৯০০ কোটি। রাজ্যের সর্বমোট ঋণের পরিমাণ দুই লাখ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। রাজ্যের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০,০০০। বিরোধী জোট এই বিষয়গুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

সরকারের বহু প্রতিশ্রুতি বছরের পর বছর ধরে অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চাৎপদ ছয় জনগোষ্ঠীর তফশিল ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি প্রবঞ্চনা এবং প্রতারণায় পরিনত হয়েছে। শিল্পী জুবিন গার্গের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদান তো দুরের কথা জুবিন হত্যায় অভিযুক্তদের সরকার রক্ষণাবেক্ষণ দেয়ার অভিযোগে উঠেছে।স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করেছিল যে জুবিন কে হত্যা করা হয়েছে।এখন তিনি উল্টো কথা বলছেন। তাই আগন্তুক নির্বাচন কেবল সাধারণ একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা নয়,এটা হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ প্রমূল্য এবং অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রাম। জনগণের শান্ত-সম্প্রীতি-ঐক্য ,এবং জীবন জীবিকার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

অসমের এবারের নির্বাচন পূর্বের তুলনায় বৈচিত্র্যময় এবং পৃথক।২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ভোট জোগাড় করা তেমন কঠিন ছিল না।কারণ সি এ এ বিরোধী আন্দোলন তখন স্তিমিত। বিজেপি অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা অনুসারে সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিল। সাথে ছিল মোদীর হিন্দুত্বের লহর। হিন্দুরা বিজেপি কে ভোট না দিলে বদরুদ্দীন আজমল

মুখ্যমন্ত্রী হবে, এবারের যুদ্ধ হবে শরাইঘাটের শেষ যুদ্ধ প্রভৃতি শ্লোগান সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিল। এবারে সেই পরিস্থিতি নেই। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বদরুদ্দীন অনেকটাই শক্তিহীন হয়েছে। অন্যদিকে বদরুদ্দীনের দল রাজ্য সভার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেয়ার ঘোষণা পর হিমন্ত - বদরুদ্দীন মিতালী প্রকাশ্যে এসেছে। 'শরাইঘাটের শেষ রণ' বলে অসমিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে অসম চুক্তি রূপায়ণে অনির্দিষ্টকালীন বিলম্ব,ছয় জনগোষ্ঠীর তফশিল ভুক্ত না করা, কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে আদানি, আম্বানি এবং রামদেবের মতো বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়ার মতো ঘটনা গুলো স্থানীয় অধিবাসীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য। সবটা মিলে এবারের নির্বাচন ব্যাতিক্রমী হবে বলাই যায়।

এপস্টিন কান্ডে ভারতেও বিতর্কের ঝড়

শুভাশিস মজুমদার

পৃথিবীতে এমন কিছু বিতর্কিত কুখ্যাত ঘটনা ঘটে যা দশকের পর দশক ধরে চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় প্রকাশিত এপস্টিন ফাইল (বহু অংশ প্রকাশিত এবং বাকিটা ক্রমশ প্রকাশ্য (!)) এমনই একটি বিষয়। জেফ্রি এপস্টিনের দপ্তরের এই নথি প্রকাশ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ভ্রষ্ট কাজ উন্মোচনের চেয়েও বেশি কিছু দেখায়। এই নথিগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা, কর্পোরেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ধনী এবং প্রভাবশালীদের মধ্যে 'বন্ধনের'একটি নতুন মডেলের অন্ধকার সত্যকে আলোকিত করে। কে এই এপস্টিন? স্কুল ড্রপ আউট এপস্টিন এক সময় অংকের স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ধনী ব্যক্তিদের ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করে প্রায় ৬০ কোটি ডলারের মালিক হয়ে যান। ক্রমশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বিল ক্লিনটন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, এহুদ বারাক (ইসরাইলের পূর্ব প্রধানমন্ত্রী) সঙ্গে। ট্রাম্প এবং এপস্টিনের প্রগাঢ় বিশেষ বন্ধুত্ব প্রায় ২০ বছরের।

ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য নানা প্রকার মনোরঞ্জনের আয়োজনের পাশাপাশি তিনি ছিলেন, নেপথ্যে থেকে, দেশ বিদেশের সরকারের (বা রাজনৈতিক) প্রতিনিধিদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের হয়েও তিনি নেপথ্যে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করতেন। এক কথায় সরকারের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, শিল্পদ্যোগী, সেলিব্রিটি প্রভৃতি ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হয়ে কাজ করা, তা' অসামাজিক বা আইন বিরুদ্ধ হতে পারে।

এপস্টিনের ক্লায়েন্ট হিসেবে উঠে এসেছে ব্রিটিশ প্রিন্স অ্যান্ড্রু, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, বিল গেট, এলন মাস্ক প্রমুখের নাম।এপস্টিনের অবৈধ কার্যকলাপের জায়গা ছিল এক সুন্দর ব্যক্তিগত দ্বীপ এবং নিউ ইয়র্কের সব থেকে দামী সাততলা প্রাসাদোপম বাড়িটি।

ইউনাইটেড স্টেটস এর ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের অংশ ৭৫ একরের এই দ্বীপটি ৮০ লক্ষ ডলারে ১৯৯৮ সালে এপস্টিন কিনেছিলেন। সমুদ্র তটে সুন্দর মহল, সুইমিং পুল, হেলিপ্যাড - সবই ছিল। প্রলোভন দেখিয়ে, ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী মেয়েদের অবৈধ ভাবে এখানে এনে অশালীন কাজে লিপ্ত করানো হত। এরা এপস্টিনের নিজের বা তাঁর ক্লায়েন্টদের লালসার শিকার হত। পালানোর কোনো উপায় ছিল না।

এপস্টিন আন্তর্জাতিক নারী পাচারকারী এবং যৌন ব্যবসায়ী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন। ২০০৮ সালের জুন মাসে এপস্টিনের ১৮ মাসের জেল হয়। কিন্তু সেই সাজা শেষ হওয়ার পাঁচ মাস আগেই তিনি মুক্তি পান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কৃতকর্ম এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে তাঁর আজীবন কারাদণ্ডই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু প্রভাবশালী আলেকজান্ডার অ্যাকোস্টার সহায়তায় তাঁর কুকর্মকে লঘু করে দেখানো হয় এবং খুব কম সাজায় এপস্টিন মুক্ত হয়ে আবার কুকর্মে লিপ্ত হয়। আলেকজান্ডার অ্যাকোস্টা পরবর্তী সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের লেবার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

এরপরে জুলি কে ব্রাউন নামে এক মহিলা সাংবাদিক বিশদে এক তদন্তমূলক সাংবাদিকতার মাধ্যমে পুরো সত্য সামনে আনেন। ২০১৮ নভেম্বরে, তাঁর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জনমতের চাপে আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে এপস্টিনের ৪৫ বছরের কারাদন্ড হয়। আশ্চর্যজনক ভাবে ১০ আগস্ট, ২০১৯, এপস্টিনকে কারাগারে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে জানানো হয়। ওই দিন জেলের ক্যামেরা অজ্ঞাত কারণবশত বন্ধ ছিল। তাই প্রকৃত সত্য কী নিশ্চিত নয়। ট্রাম্পের সাপোর্টারা বিল ক্লিনটনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেন, ক্লিনটনই এপস্টিনকে হত্যা করিয়েছেন নিজের কুকর্ম চাপা দেয়ার জন্য। নির্বাচনের আগে ট্রাম্প প্রচার চালান, ভোটে জিতলে তিনি এপস্টিন ফাইল প্রকাশ করবেন। কিন্তু ২০২৫ এর জানুয়ারিতে, ভোটে জয়ী হওয়ার পরে ট্রাম্প এই নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্চ করেন নি। আর, ২০২৫ এর জুলাই মাসে, এপস্টিনের

খদ্দেরদের কোনো তালিকার (ক্লায়েন্ট লিস্ট) অস্তিত্ব নেই বলে ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার দপ্তর (জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট) জানিয়ে দেয়। ট্রাম্প নিজেও এপস্টিন ইস্যু (বিতর্ক) একঘেয়ে (বোরিং) এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির বিভ্রান্তিমূলক (হোক্স) প্রচার বলে উড়িয়ে দিতে চান। ইতিমধ্যেই, ট্রাম্পের সাথে দ্বন্দ্ব চলাকালীন এলন মাস্ক অভিযোগ করেন, এপষ্টিন ফাইলে ট্রাম্পের নাম আছে। জনমানসে সন্দেহ দানা বাঁধে। জনগণের চাপে ইউ এস কংগ্রেসে নভেম্বর, ২০২৫, এ বিল পাশ করানো হয়। উদ্দেশ্য, ৩০ দিনের মধ্যে এই ফাইল প্রকাশ করা। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান - দুই দলই সমর্থন করে এই বিলকে। ১৯ নভেম্বর, ২০২৫, ট্রাম্প এই বিলে সই করতে বাধ্য হন। এপস্টিন ফাইল ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট তৈরি হয়।

১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫, ইউ এস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট জেফ্রি এপস্টিনের কয়েক হাজার ফাইলের তথ্য সামনে আনে। ২৩ ডিসেম্বর আরো তথ্য প্রকাশিত হয়। ২০২৬ এর ৩০ জানুয়ারি, ইউ এস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট ৩০ লক্ষের বেশি পৃষ্ঠার ফাইল প্রকাশ করে। এতে এক লক্ষ আশি হাজার ছবি এবং ২০০০ ভিডিও প্রকাশ পায়। অসংখ্য ইমেইল ও টেক্সট মেসেজ প্রকাশ পেয়েছে।

এপস্টিন ফাইলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম অগুন্তিবার উঠে এসেছে। বাদ যায়নি ভারতের প্রভাবশালীদের নাম। সব থেকে বেশি নাম এসেছে শিল্পপতি ব্যবসায়ী অনিল আম্বানির নাম। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, থেকে জুন, ২০১৯, সময়কালের মধ্যে অনিল আম্বানি ও এপস্টিনের মধ্যে অনেক টেক্সট মেসেজ ও ইমেইল চালাচালি হয়েছে বলে খবর প্রকাশ পেয়েছে। ২০১৭, ২ মার্চে, অনিল আম্বানি, হোয়াইট হাউসের সঙ্গে প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তির ব্যাপারে এপস্টিনের সাহায্য চেয়ে ইমেইল করেন। ১৬ মার্চে (২০১৭) অনিল আম্বানি আবার ইমেইল করে এপস্টিনকে বলেন, 'নেতৃবর্গ (ভারত সরকারের) আপনার সহায়তা চায়, যাতে আমি জারেড (কুশনার) (ট্রাম্পের জামাতা ও প্রধান উপদেষ্টা) ও (স্টিভ) ব্যাননের (হোয়াইট হাউসের প্রধান কৌশলী) সাথে মিলিত হয়ে বৈঠক করতে পারি।'

মে, ২০১৯, এ অনিল আম্বানি ব্যক্তিগতভাবে এপস্টিনের ম্যানহাটনের বাড়িতে গিয়েছিলেন, বলে খবরে প্রকাশ। ভারতে মন্ত্রী হওয়ার আগেই, এপস্টিনের সাথে হরদীপ পুরী বহুবার ইমেইল চালাচালি ও অন্তত তিন বার বৈঠক করেছেন বলে জানা যাচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীর ২০১৭ সালে ইজরায়েল ভ্রমণের প্রসঙ্গে এপস্টিন ফাইলে উল্লেখ আছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইচ্ছায় বিশেষ উদ্দেশে মোদী ইজরায়েল ভ্রমণ করেন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তা অস্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, এই সব কিছুই ঘটেছে যখন ইতিমধ্যেই ২০০৮ সালে (জুন মাসে) জেফ্রি এপস্টিন অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে সাজা প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। একজন কুখ্যাত ঘোষিত অপরাধীর সাথে ভারতীয় বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের যোগাযোগ বলে যা খবরে প্রকাশ পাচ্ছে, অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এর সব কিছুই তদন্ত সাপেক্ষ।

আরো উল্লেখযোগ্য, এপস্টিন ফাইলে যাঁদের নাম দেখা গেছে তাঁরা সকলেই যে যৌন সম্বন্ধীয় বিতর্কে জড়িত, তেমনটা নয়।

ইতিমধ্যেই, বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি, বিভিন্ন সম্মানজনক পদাসীন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি এপস্টিন ফাইলে নাম উঠে আসায় পদচ্যুত হয়েছেন।

মনরেগা বাঁচাও যাত্রা

জিতেন নন্দী

মহাত্মা গান্ধি রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি আইন, সংক্ষেপে মনরেগা-র সাংবিধানিক অধিকারের ভাবনাকে রক্ষা করার জন্য এক মাস ব্যাপী অভিযান সমাপ্ত হয়েছে। ১৭ই জানুয়ারি থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন গান্ধীবাদী ছাত্র-যুব, শ্রমিক এবং সমাজ-কর্মীরা। কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে মনরেগার চালু অধিকারকে খর্ব করে এক নতুন আইনি ব্যবস্থা VB-G RAM G কায়েম করেছে। এর বিরুদ্ধে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ছাত্র-কর্মী এবং গান্ধীবাদী ভাবনার সঙ্গে যুক্ত যুবক-যুবতীরা স্থির করে যে তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রার সূচনা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গান্ধিজির কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র গোরখপুরের চৌরিচৌরা গ্রাম থেকে এই যাত্রা শুরু হয় ১৭ই জানুয়ারি। তারিখটা ছিল রোহিত ভেমুলাকে স্মরণ করার দিন। গোরখপুর থেকে শুরু করে দেওরিয়া, বলিয়া, মউ, গাজীপুর হয়ে বেনারস পৌঁছে যাওয়ার মাঝে ২৫০টি গ্রাম, ৭০টি বাজার এবং মোট ১২০০ কিলোমিটার পথ সাইকেলে অতিক্রম করেন যাত্রীরা।

সকলের মনে আছে, দুই দশক আগে যখন মনরেগা চালু হয়নি, গ্রামের গরিব ও শ্রমজীবী মানুষকে ৩-৪ কেজি আনাজ পাওয়ার জন্য রোদ-বৃষ্টি-শীত উপেক্ষা করে কাজ করতে হয়েছে। তারপর ২০০৫ সালে চালু হয়েছিল মনরেগা। সেই অধিকার আজ ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই দলিত, আদিবাসী, ভূমিহীন -- যাদের জন্য এসেছিল

মনরেগা অধিকার তাদের সঙ্গে আলোচনা জরুরি।

করোনা মহামারীর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন হাতের কাজ ছেড়ে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তখন মনরেগা সাহারা হল, কিছু কাজ এবং আয়ের বন্দোবস্ত হল। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল গ্রামের গরিব কর্মহীন মানুষের এই আয়ের বন্দোবস্তকে সুনিশ্চিত করা, ১০০ দিনের বদলে ২০০-২৫০ দিন কাজ এবং ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করা। সেই পথে না গিয়ে সরকার)ঙ্ক-ঝ ট্রঞ্চঞ্চঝ আইনে স্থির করল, তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাজের ক্ষেত্রেই এবং সীমিত বাজেটের বরাদ্দ অর্থের মধ্যেই সেই রোজগার হবে। আগে মনরেগার ৯০ ভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিত, নতুন স্কিমে তা কমিয়ে ৬০ ভাগ করা হল। এছাড়া ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা ও বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেও বহু শ্রমজীবী মানুষকে এই স্কিমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ-টা পর্যন্ত সাইকেল যাত্রা চলেছে। পথের মাঝে গ্রামগুলিতে খাওয়াদাওয়া সারতে হয়েছে। সকালবেলায় স্থির করে নেওয়া হত সেদিন কোন গ্রামে গ্রামসভা হবে আর কোথায় রাতের বিশ্রাম হবে। সব জায়গায় উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়নি, পথের মাঝেই খাওয়াদাওয়া সারতে হয়েছে। আবার অনেক জায়গাতেই গ্রামের মহিলারা নিজেরা আমাদের খাওয়ার আয়োজন করেছে।

৩২ দিন সাইকেল যাত্রা চলেছে। দলিত বস্তিতে বৈঠক হয়েছে; মহিলা-শ্রমিকদের সঙ্গে চর্চা হয়েছে, পথসভা, গান-শ্লোগান- লিফলেট বিলির মাধ্যগুলির মাধ্যমে মনরেগা-শ্রমিকদের জরুরি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে , মজুরি পেতে দেরি, বাজেট কাটছাঁট, ন্যূনতম ৫০০টাকা মজুরি, ডিজিটাল হাজিরার মতো সমস্যাগুলি সামনে এসেছে। এই যাত্রায় অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী জঁ দ্রেজ যোগ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনায় গ্রামীণ সংকট ও আর্থিক অসাম্যের আজকের পরিস্থিতিতে গ্রামের গরিব মানুষের রোজগারের গ্যারান্টির গুরুত্ব নিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। পুরো যাত্রাপথে গ্রামের মহিলা-শ্রমিকদের আওয়াজ সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় লোকে জানায় যে মনরেগা-র মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পুকুর খনন, রাস্তা নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ, বাঁধ নির্মাণ ও জল সংরক্ষণের মতো কাজগুলি হতে পেরেছে। কয়েকটি জায়গায় চাষিরা জানায় যে মনরেগা-র মাধ্যমে খেতের জলমগ্নতা আটকানো, মাটি সংরক্ষণ এবং সেচের কাজে উন্নতি হয়েছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারি বেনারসের কাছারিতে ডা. ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তির সামনে একদিনের উপবাসের মধ্য দিয়ে যাত্রার সমাপ্তি হয়।

ধারাবাহিক

কমিউনিস্ট পার্টির শতবর্ষ

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বিংশতি কংগ্রেস

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।এই পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএসইউ) বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা হয় ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। সোভিয়েত পার্টির মতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংগ্রামও একটি শ্রেণি সংগ্রাম। অপরদিকে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে যে কোনও মূল্যে প্রতিরোধ করা ও ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের কথাও বলা হয়। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্প যুদ্ধ না হলে যে সঙ্কটে পড়বে তাতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনীতিতেও সঙ্কট সৃষ্টি অনিবার্য বলেও বলা হয়। ভারতবর্ষ সহ সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক পথকে এড়িয়ে অধনতান্ত্রিক পথে বিকাশ ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলা হয়। এই সঙ্গে স্তালিনের আমলে সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতভেদ ও তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু হয়। চিনের পার্টির মতে, বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য ও কাম্য। কেননা এই যুদ্ধ দেশে দেশে বিপ্লবের জন্ম দেবে ও সেই বিপ্লব অবশেষে যুদ্ধকে প্রতিহত করবে। চিনের পার্টি শান্তির জন্য সংগ্রাম ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্বকে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি বলে অভিহিত করে। এই সঙ্গে চিনের পার্টি ভারতের নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে একটি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ অলম্বনকারী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দল বলে অভিহিত করে।

চিনের ভারত আক্রমণ

ভারতে নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে যে বিতর্ক চলছিল সোভিয়েত ও চিনের কমিউনিস্ট পার্টির মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। চিনের তিব্বত অধিকারের পর

থেকেই চিন তিব্বতের সীমান্তবর্তী লাদাখ (জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত) অঞ্চল ও অসমের উত্তরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি (এন.ই.এফ.এ. বা NEFA যা বর্তমান অরুণাচল প্রদেশের একটি বৃহৎ অংশ) তাদের ভূখণ্ডের অর্থাৎ তিব্বতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি জানিয়ে আসছিল। এই ভূখণ্ডসমূহের সঙ্গে চিনের সীমান্তের কোনও যোগ নেই। যেহেতু চিনের মতে, এগুলি তিব্বতের অংশ এবং তিব্বত চিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই এই ভূখণ্ডসমূহ চিন তাদের বলে দাবি করে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি এই সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য চিনকে দায়ী না করলেও তারা চিনের এই আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করেনি। তাদের মতে, এই সীমান্ত সংঘর্ষ কাম্য ছিল না। নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারকে সোভিয়েত পার্টি সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক বলেও অভিহিত করেনি। এই যুদ্ধে চিন লাদাখ ও নেফার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে। যদিও যুদ্ধ শুরু হবার পর এক মাসের মধ্যেই চিন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ও নেফা'র দখলিকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে তারা ম্যাকমোহন লাইনের (যা তিব্বত ও নেফা'র সীমান্তকে চিহ্নিত করেছে) ওপারে ফিরে যায়। কিন্তু লাদাখের উত্তরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁদের দখলে থেকে যায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙন ও চিনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।এই সময় চিনের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মুখপত্র Peoples Dailey তে সিপিআই কে আক্রমণ করে 'Mirror of Revisionism' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ।এর জবাবে এস এ ডাঙ্গে 'Neither Revisionism nor Dogmatism is our guide' শীর্ষক নিবন্ধটি লেখেন ও তা পার্টির মুখপত্র New Age এ প্রকাশিত হয়।ওই নিবন্ধে এস এ ডাঙ্গে বলেন , চিনের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিকতা ত্যাগ করে উগ্র জাতীয়তাবাদের পথ গ্রহণ করেছে। একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতকে, যে দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশের বন্ধু ও পঞ্চশীল নীতির রচনাকার , সেই দেশকে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে আলোচনার পরিবর্তে আক্রমণ করেছে।

পার্টির জাতীয় পরিষদের ১১২ জন সদস্যের মধ্যে ৩২ জন সদস্য ১৯৬৩ সালের জুন মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের 'তেনালি'তে এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে নতুন পার্টি গঠন করেন। নতুন পার্টির নামকরণ করা হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। এই পার্টি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের মধ্যে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্যকে সমর্থন করে। চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এই পার্টি চিনের বক্তব্যকেই সঠিক বলে প্রকারান্তরে সমর্থন করে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ সাধারণ সম্পাদক ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ বলেন যে দশ হাজার ফুটের অধিক উচ্চতার এলাকাসমূহে প্রকৃত ঘটনা কী ঘটেছে তা বলা সম্ভব নয়। তবে বরফাচ্ছাদিত তৃণগুল্মহীন এই সব এলাকা পুনরুদ্ধারের নামে ভারতের মতন বন্ধু দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা এ সম্পর্কে অবশ্য চিনপন্থী পার্টি নেতৃত্ব কোনও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। একটা কথা তাঁরা বলতেন যে কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশ (পড়ুন চিন) কখনও পররাজ্য আগ্রাসন করতে পারে না। পরবর্তী সময়ে, ১৯৭৮ সালে যখন সম্প্রসারণবাদী ও উগ্রজাতীয়তাবাদী চিনা কমিউনিস্ট পার্টি ভিয়েতনাম আক্রমণ করে এবং বলে ভিয়েতনামকে উচিত শিক্ষা দেব, তখন অবশ্য সিপিআই(এম) নেতৃত্ব নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে। মনে রাখা প্রয়োজন এর তিন বছর আগে ১৯৭৫ সালে মরণপণ সংগ্রাম করে ভিয়েতনাম মার্কিন সাম্প্রাজ্যবাদকে ভিয়েতনাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল।

পার্টিতে ভাঙনের আগে থেকেই সিপিআই (এম) নেতৃত্ব, সিপিআই নেতৃত্ব বিশেষ করে এস এ ডাঙ্গেকে তীব্র ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে থাকে। এমনকী একটি জাল চিঠিকে ডাঙ্গের বলে প্রচার করা হয়। যাতে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার সময় ডাঙ্গে জানাচ্ছেন, তিনি মুক্তি পেতে আগ্রহী। পার্টির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এই চিঠিটি জাল বলে চিহ্নিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ডাঙ্গেই পূর্ণ সময় (চার বছর) কারাদণ্ড ভোগ করেন। ডাঙ্গে ব্রিটিশ শাসনামলে মোট ১৬ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। পার্টির শক্তিশালী দুটি রাজ্য কমিটি যথাক্রমে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ-এর অধিকাংশ সদস্যই নতুন পার্টিতে যোগ দেন। এই দুই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের একটি বড় অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। তাই এই দুই রাজ্যেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনসাধারণের একটি বড় অংশ কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরও দুটি উপাদান যুক্ত হয়েছিল। একটি হচ্ছে বাংলার মানুষের ঐতিহাসিকভাবেই উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যবিরোধী মনোভাব গ্রহণ করার প্রবণতা। সুভাষচন্দ্র, ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। কমিউনিস্ট পার্টির 'পাকিস্তান' দাবিকে সমর্থন করার বিষয়টি মানুষ জানতেন না। যারা জানতো তাঁরা তা বিস্মৃত হয়েছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি

নতুন গণভিত্তি গড়ে তোলে এবং দেশ বিভাগের যাবতীয় দায় কংগ্রেসের ওপর চাপিয়ে দেয়। হিন্দুত্ববাদী জনসংঘের প্রভাবশালী নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুও কমিউনিস্ট পার্টিকে আত্মশক্তি বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। আর এই কারণেই কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার আগে ও পরে তীব্র কংগ্রেসবিরোধী প্রচারের সাহায্যে সিপিআই(এম) এই রাজ্যে শক্তিশালী পার্টিরূপে সেই সময় আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই.(এম) এর চমকপ্রদ নির্বাচনী সাফল্য হয় ও তারা সরকার গঠন করে। এই দল পরবর্তী ৩৪ বছর রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি একদা উদ্বাস্তু আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালে বহু আশা নিয়ে ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসিত জনসাধারণের একটি বড় অংশ দলে দলে এই রাজ্যে ফিরে আসতে থাকে ও সুন্দরবনের শেষপ্রান্তে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্মমভাবে উচ্ছেদ করে। ওই ঘটনার মধ্যেই সিপিআই (এম)-এর ভবিষ্যতে পতনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। (চলবে)

জরুরি অবস্থার পরবর্তী পরিস্থিতি

সুশান্ত দাশগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪)

অকালি দলের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান

১৯৭৭ সালে সর্বাত্মক কংগ্রেস বিরোধী জোটে অকালি দল অংশগ্রহণ করে। জনতা পার্টি (যার মধ্যে জনসংঘ ছিল), সিপিআই (এম) ও অকালি দলের নির্বাচনী জোট পাঞ্জাবে প্রথমে লোকসভা ও পরে বিধানসভা নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়। অকালি দল ও জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। সিপিআই (এম) অবশ্য এই সরকারে যোগ দেয়নি। দুটি ধর্মভিত্তিক দল জনসংঘ ও অকালি এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হয়, যারা তীব্র কংগ্রেস বিরোধী ও একই সঙ্গে তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী। জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করে দিলে যে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে সব চাইতে বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় ও অবশেষে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয় ; এই সত্যটি জনতা পার্টির অভ্যন্তরের সমাজবাদীরা ও সিপিআই (এম) বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে পাঞ্জাবে ও কেন্দ্রে অকালি দলের ও তাদের জোটের জনতা পার্টি সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। ওই সময়ে ১৯৭৩ সালে তাদের দ্বারা রচিত আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কোনও উদ্যোগ অকালি দলের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। পরিবর্তে তারা শিখ জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের মৌলবাদী মতবাদের প্রভাব আরও দৃঢ়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিল। শিখদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় 'নিরঙ্করী'। এরাও শিখ কিন্তু এরা মনে করেন শিখধর্মে 'গুরু' বা 'অবতার' যুগে যুগে আসতেই পারেন। গোঁড়া শিখরা ও অকালি দল মনে করে ১০ম গুরু গোবিন্দ সিংই শেষ শিখ গুরু এবং এর পর আর কোনও শিখ গুরু আসবে না। গুরুবাণী নিহিত আছে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থ সাহিবের ' মধ্যে। এই নিয়ে নিরঙ্করীদের সঙ্গে অকালিদের নিত্য অশান্তি। অকালিরা তখন ক্ষমতাসীন, ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে নিরঙ্করীদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল অমৃতসরে। অকালিদের মদতপুষ্ট সশস্ত্র যুবকরা ওই অধিবেশনে আক্রমণ চালায়। দুপক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত হয়। এই নিরঙ্করী বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেন একজন যুবক, যাঁর নাম জার্নাল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালে।কিন্তু অকালি দল নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সরকারের পুলিশ তাঁকে কিছুই করল না।

জার্নাল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালের উত্থান

১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধি বিপুলভাবে জিতে ক্ষমতায় ফিরে এলেন। যেমনভাবে কেন্দ্রের জনতা পার্টির সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সরকারগুলিকে সমর্থন হারিয়েছে বলে বরখাস্ত করে, সেই একই যুক্তিতে ইন্দিরা গান্ধি বিভিন্ন রাজ্যের জনতা সরকারগুলিকে ও পাঞ্জাবের অকালি-জনতা জোট সরকারকে বরখাস্ত করেন।পাঞ্জাবে ১৯৮০-র বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভালোভাবেই জিতে ক্ষমতায় ফিরে এল। এইবার - অকালি দলের 'আনন্দপুর সাহিব' প্রস্তাবের কথা মনে পড়ল। তারা আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাবের দাবিগুলি অবিলম্বের কার্যকর করার জন্য এইবার আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেয়।

১৯৮০ সালের এপ্রিলে নিরঙ্করীদের প্রধান বাবা গুরুবচন সিং খুন হন দিল্লিতে। তাঁর খুনের সঙ্গে ভিন্দ্রানওয়ালে জড়িত বলে পুলিশ সন্দেহ করে। হরিয়ানার একটি গুরুদ্বারে তখন ভিন্দ্রানওয়ালে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ সেখানে তাঁকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ফিরে আসে। কেন না তার আগেই সে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দরবারা

সিং ভিন্দ্রানওয়ালেকে স্বর্ণমন্দির থেকে গ্রেফতার করতে চাইলে জৈল সিং, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বর্ণমন্দির থেকে তাকে গ্রেফতার করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে গ্রেফতার স্থগিত রাখেন। ভিন্দ্রানওয়ালে শর্ত দেন তিনি স্বর্ণমন্দিরের বাইরে অন্য কোনও স্থানে গ্রেফতার হতে রাজি আছেন। সেই শর্ত অনুযায়ী তাকে অন্যত্র পুলিশ গ্রেফতার করে। এই সময়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হয়। কিন্তু নিরঙ্কারী প্রধান হত্যায় তার জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ না পেয়ে পুলিশ তাকে একমাস পর ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় ভিন্দ্রানওয়ালের মর্যাদা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়।

অকালি নেতা হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল তখন স্বর্ণমন্দিরে বসেই তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন। তিনি স্বর্ণমন্দিরে পরম সমাদরে ভিন্দ্রানওয়ালেকে আশ্রয় দেন। ভিন্দ্রানওয়ালে 'দমদমি তাকশাল' গঠন করে ওই সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। একই সময়ে ১৯৮০ সালের জুন মাসে একসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , গ্রেট ব্রিটেন , কানাডা ও ফ্রান্স থেকে স্বাধীন ' খালিস্তান ' ঘোষণা করে বলা হয় জগজিৎ সিং চৌহান এই স্বাধীন খালিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান। ১৯৮১ সালের এপ্রিলে ' হিন্দ সমাচার ' পত্রিকার সম্পাদক লালা জগতনারায়ণ খুন হন। তিনি সাহসের সঙ্গে খালিস্তান দাবির বিরোধিতা করছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর পুত্র ,ওই পত্রিকারই সম্পাদক রমেশ চন্দ্রও খুন হয়ে যান।

গোটা ১৯৮২ দল জুড়ে অকালী দলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দফায় দফায় আলোচনা হয়।এবার অকালিরা তাদের আগের দাবিগুলির সঙ্গে নতুন দাবি যুক্ত করে।তারা এইবার বলে, ভাকরা নাঙ্গালের জলাধার থেকে হরিয়ানা ও রাজস্থান রাজ্যকে কোনওভাবেই জল দেওয়া যাবে না। এই দাবি কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিধানসভার সমস্ত অকালি সদস্যরা পদত্যাগ করে। ওই বছরের ২২ এপ্রিল তারিখে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এ.এস. অটোওয়াল যখন অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির থেকে বেরোচ্ছেন তখন তাকে এক যুবক গুলি করে হত্যা করে। যুবকটি নির্বিকারে আবার স্বর্ণমন্দিরে ঢুকে যায়। তাকে আর গ্রেফতার করা যায়নি। হিন্দুদের ও শিখদের মধ্যে যারা প্রগতিমনা তাঁদের ও সাধারণ মানুষের ওপর হত্যালীলা চলতে থাকে। পুলিশের মনোভাব একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকে।

জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির ইতিবাচক পরিবর্তন

ভারত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। এই আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দু তাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করাই শুধুমাত্র জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য বলে পণ্ডিত নেহরু কখনই মনে করেননি। ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন, সদ্য স্বাধীন দেশগুলির নিজস্ব স্বাধীন স্বয়ম্ভর আর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা প্রভৃতি বিষয়গুলিতে পণ্ডিত নেহরু সর্বদাই জোর দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সমালোচকরা পন্ডিত নেহরুকে সর্বদাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পক্ষপাতিত্বের দায়ে সমালোচনা করে এসেছে। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতায় আসার পর জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন- চিন অক্ষশক্তির পাকিস্তানের সামরিক জুন্টাকে সমর্থন প্রতিহত করার জন্য তিনি ১৯৭১ এর ৯ আগষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ২০ বছর মেয়াদি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন করেন। এতে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ভারতীয় ক্রীড়নকরা প্রবল ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

জনতা দল (যার মধ্যে ছিল জনসংঘ, আজকের বিজেপি) ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই প্রচার করেছিল যে তারা ক্ষমতায় এলে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি বাতিল করবে ও খাঁটি জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে। ক্ষমতাসীন হয়ে জনতা দল এই চুক্তি বাতিল করবার সাহস ছিলনা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে দৃঢ় নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলেন।

১৯৭৮ সালে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির 'হাভানা' সম্মেলনে ভারত অংশগ্রহণ করলেও নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করে। ওই সম্মেলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যম তীব্র প্রচার চালায়, যার মর্মার্থ ছিল ফিদেল কাস্ত্রো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনটিকে 'হাইজ্যাক' করেছেন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পক্ষে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করছেন। শুধু তাই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন মিত্র চিনের সম্প্রসারণবাদী নেতৃত্ব যখন ১৯৭৯-তে ভিয়েতনাম আক্রমণ করে তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাজপেয়ী বেইজিং-এ সফররত। তিনি ওখানে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলেন।

ভারতে সংসদের উভয় কক্ষে এই নিয়ে সিপিআই ও কংগ্রেস সদস্যরা তুমুল প্রতিবাদ জানান। বিশেষ করে রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্ত অসাধারণ বক্তৃতা দেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই বাজপেয়ীকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে অনেন।

ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন

ইন্দিরা গান্ধি ১৯৮০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের কার্যকর ভূমিকাকে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৮৩ সালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লিতে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার শতাধিক দেশ ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতৃবৃন্দ যথা ফিদেল কাস্ত্রো, ইয়াসের আরাফত প্রমুখ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

এই সম্মেলনকে বানচাল করতে ঠিক এই সময়ে অকালি দল দিল্লি অভিযানের ডাক দেয়। তারা রেডিও স্টেশন দখলের আহ্বান জানায়। ওই একই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনসমূহ, যাদের মাধ্যে বামপন্থীদের সংগঠনও ছিল, তারাও ধর্মঘট আহ্বান করে। অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি, ধর্মান্ধ শক্তি ও বামপন্থী হটকারী শক্তি একত্রে এমন একটি রণকৌশল রচনা করেছিল যাতে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন বানচাল হয়।ইন্দিরা গান্ধি দৃঢ়তার সঙ্গে অকালীদের এই অভিযানকে দিল্লির সীমান্তে প্রতিহত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। সাফল্যের সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফিদেল কাস্ত্রো ইন্দিরা গান্ধিকে ' বিপ্লব দুহিতা ' বলে সম্বোধন করেন।

আশ্চর্যের বিষয় সিপিআই ও সি পি আই (এম) গোটা ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। (চলবে)

পুস্তক পর্যালোচনা

মহাত্মা গান্ধির কর্মময় জীবন ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে জানতে গেলে এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য

মহাত্মা গাঁধী (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

লেখক : বিপুল রঞ্জন সরকার

প্রকাশক : পুনশ্চ

প্রতি খণ্ড ৯৭৫.০০ টাকা

মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কে ১৯০৯ সালে , তখনও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় , প্রথম তাঁর জীবনী রচনা করেন জোসেফ জে ডোক । এই গ্রন্থে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তিনি ১৯১৫ সালে দেশে ফেরার পর তাঁকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় রচিত হয় অসংখ্য গ্রন্থ , কাব্য ,জীবনী। ইংরেজি সহ অনেক বিদেশী ভাষায় সেগুলি অনূদিত হয়। তাঁর জীবনী রচনা করেন ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিক রম্যা রল্যা। কবিগুরু তাঁকে ' মহাত্মা ' বলে সম্বোধন করেন।

মহাত্মা গান্ধির আত্মকথা An Autobiography Or The Story of my experiments with truth প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে । এটি গুজরাতি ভাষায় অনুবাদ করেন তাঁর সচিব মহাদেব দেশাই । প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে । বাংলা ভাষায় ' আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ 'শিরোনামে এটির অনুবাদ করেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তারপর পর্যায়ক্রমে এটি প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

স্বাধীনতার ৫ মাস পর এক হিন্দুত্ববাদি উন্মত্ত খুনি মহাত্মাকে হত্যা করে। কিন্তু তারপরও তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ।আলোচিত গ্রন্থের লেখক বিপুল রঞ্জন সরকার তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রস্তাবনায় মহাত্মা গান্ধিকে কেন্দ্র করে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির বিবরণ দিয়েছেন। প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার লিখিত মহাত্মার জীবনী The Life of Mahatma Gandhi প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে । গান্ধিজির রচনা , ইয়ং ইন্ডিয়া ও হরিজন পত্রিকায় তাঁর লেখা , বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদন প্রভৃতির ভিত্তিতে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ কালপর্বে ডি.জি. তেন্ডুলকর রচনা করেন আট খণ্ড বিশিষ্ট ' মহাত্মা দ্যা লাইফ অফ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ।' গান্ধিজির সচিব প্যারেলাল নায়ার ও তাঁর বোন ডা.সুশীল নায়ার উভয়েই গান্ধিজির অত্যন্ত স্নেহভাজন ও বহু বছর তাঁর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ছিলেন ।তাঁরা দশ খণ্ডে প্রকাশ করেন গান্ধীজির জীবনী।প্যারেলালজির সংগ্রহে গান্ধিজির বহু চিঠিপত্র,লেখা ইত্যাদি ছিল। ১৯৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ডা.সুশীলা নায়ার মারা যান ২০০১ সালে।তাঁদের কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। এই সমস্ত চিঠিপত্র, লেখা ইত্যাদি দেওয়া হয় নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরিতে।এই বিপুল সংখ্যক ফাইল,নোট , চিঠিপত্র গান্ধিজির জীবন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে আরও আলোকপাত করে ।এর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত তথা , সংবাদপত্র ইত্যাদির সহায়তা নিয়ে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ রচনা করেন অতীব মূল্যবান দুটি গ্রন্থ ২০১৩ তে ' গান্ধি বিফোর ইন্ডিয়া ' ও ২০১৮ তে ' গান্ধি দ্য ইয়ার্স দ্যাট চেঞ্জড দ্য ওয়ার্ল্ড ১৯১৪ - ১৯৪৮।'

১৯৬৯ সালে মহাত্মা গান্ধির জন্ম শতবর্ষে গান্ধি স্মারক নিধি ও শতবর্ষ উদযাপন কমিটি তাঁর রচনার নির্বাচিত সংকলন বাংলা ভাষায় ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করেন ।২০১৯ সালে প্রকাশিত কলকাতা বইমেলার ডাইরেক্টরি অনুযায়ী বাংলা ভাষায় মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে ৪২৫ টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে ।এছাড়াও বিভিন্ন পত্র

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য মূল্যবান নিবন্ধ । কিন্তু বাংলাভাষায় গান্ধিজির বিশাল কর্মময় জীবন নিয়ে কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থর অভাব ছিলো দীর্ঘ দিনের ।শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার রচিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ' মহাত্মা গান্ধি ' এই অভাব পূরণ করবে। লেখক লিখেছেন, তিনি যৌবনকালে গান্ধিজি বিরোধী পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন।গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের ত্রিপুরি কংগ্রেসের সময় এই বিরোধ জাতিরূপে বাঙালিকে বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে।তবে এই মত পার্থক্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।লেখক দেখিয়েছেন এই পর্বেই সুভাষচন্দ্র গান্ধিজিকে ' ভারতের মহত্তম মানুষ ' বলেছেন। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর একটি ব্রিগেড-এর নামকরণ করেছিলেন গান্ধিজির নামে ।২- ১০- ৪৩ এ বাপুর জন্মদিন পালন ও আজাদ হিন্দ বেতারে ৬-৭-৪৪ এ সুভাষের ভাষণে তিনি মহাত্মা গান্ধিকে ' জাতির জনক ' বলে সম্বোধন করেন।

১৯৫০ এর দশকের গোড়ায় গান্ধি- সুভাষ বিরোধ যথেষ্ট চর্চার বিষয় এবং বাঙালির চিন্তাজগতে গান্ধি বিরোধী সুর প্রবল।বামপন্থী ঘরানার রাজনীতিতেও গান্ধিজিকে নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক ছিল। লেখক এই সময়ে কমিউনিস্ট নেতা ই এম এস নাম্বুদ্‌রিপাদ- এর ' মহাত্মা অ্যান্ড দ্য ইজম ' এবং মার্কসবাদী সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর ' গান্ধিজি- এ স্টাডি ' বই দুটি পড়ার সুযোগ পান।গান্ধিজি ও গান্ধিবাদের সমালোচনায় নিয়োজিত দুটি বই পড়ে লেখকের মধ্যে গান্ধিজি ও তাঁর মতবাদ সম্পর্কে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয় । তারপর এক দশকের বেশি সময় যাবৎ পরিশ্রম করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ মহাত্মা গান্ধির এই জীবনীগ্রন্থে প্রথম দুই খণ্ডে লেখক মহাত্মা গান্ধির ' জীবন ও বাণী ' তুলে ধরেছেন।প্রথম খণ্ডটি ৫২ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।তাতে রয়েছে গান্ধিজিকে নিয়ে তাঁর জীবনকালে যে ধ্বষ্ঠঅর্থাৎ কিংবদন্তি গড়ে উঠেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।তাঁর জীবনই তাঁর বাণী, এই কথা গান্ধিজি বহুবার বলেছেন।তিনি কোনও ধর্মগুরু ছিলেন না।তিনি তাঁর দেশের মানুষের উদ্দেশে কখনও কোনও বাণী প্রদান করেন নি। তাঁর কাজের মাধ্যমেই তিনি আপামর দেশবাসীর কাছে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন ।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে রয়েছে তাঁর শৈশবকাল ও বিবাহ । বাল্যকাল থেকে সত্যকে অবলম্বন করে থাকা মোহনদাসের পরিচয় । লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া। দেশে ফিরে ওকালতি পেশায় অসফল মোহনদাস তাঁর দাদার চেষ্টায় পোরবন্দর নিবাসী ধনী বোহরা মুসলিম ব্যবসায়ী দাদা আবদুল্লার দক্ষিণ আফ্রিকার কারবারের একটি মামলার কাজে আইনী সহায়তা দেওয়ার জন্য ১৮৯৩ সালের ২৪ মে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল বন্দরে গিয়ে পৌঁছান । এই কাজের মাধ্যমে তিনি আইনী অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।এই সময়ের মধ্যে তিনি বর্ণ বিদ্বেষের নগ্ন রূপ প্রত্যক্ষ করেন। দুই বছর পর তাঁর দেশে ফেরার সময় তিনি জানতে পারেন আসন্ন নির্বাচনে ভারতীয়দের কোনও ভোটাধিকার থাকবেনা। তিনি তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলে তাঁকে ব্যবসায়ীরা বলেন , তারা এইসব নিয়ে প্রতিবাদ করার কথা ভাবতেও পারেন না । মি . গান্ধি যদি নেতৃত্ব দেবার জন্য এই দেশে থাকেন তাহলে তাঁরা তাঁকে সহায়তা করবেন ।গান্ধিজি বর্ণ বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে সংগ্রামের জন্য দুই দশক দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকেন। প্রায় সমগ্র যৌবনকাল ওই দেশে কাটিয়ে , তিনি বর্ণ বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে এক বিরল প্রকৃতির সংগ্রাম গড়ে তোলেন।মোহনদাস উন্নীত হন ' মহাত্মা'য় । দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ন বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নায়ক ও গান্ধিজির অনুসারী নেলসন ম্যান্ডেলা দিল্লির রাজঘাটে গান্ধিজির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিলেন 'ভারত আমাদের দিয়েছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, আমরা ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছি মহাত্মা গান্ধি।' গান্ধিজি ১৯১৫ সালে দেশে ফিরে আসেন ।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধিজির সংগ্রাম ছাড়াও রয়েছে এই দেশে কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করার কাহিনি । প্রধান প্রধান গণ সংগ্রামের ইতিহাস ।নেতাজি ২ অক্টোবর ,১৯৪৩ - এ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন .দ.....কুড়ি বৎসর কিংবা তাহারও অধিককাল ধরিয়া মহাত্মা গান্ধি ভারতের মুক্তির জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত কাজ করিয়া চলিয়াছেন ভারতীয় জনসাধারণও। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ১৯২০ সালে তিনি যদি তাঁহার আন্দোলনের অস্ত্র লইয়া না আসিতেন তাহা হইলে সম্ভবত আজও ভারত হতাশায় মুহ্যমান থাকিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সেবা অমূল্য ও অতুলনীয়। অনুরূপ অবস্থায় একটি মাত্র জীবনকালে একটি মাত্র ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারেন না।'

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ৩২ টি অধ্যায় ।এই খণ্ডে গান্ধিজির মতাদর্শ ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিচারধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডে আছে তাঁর সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় , শিক্ষানীতি , নারীশক্তি (সুভাষচন্দ্র Indian Struggle-এ ১৯৩৪ সালে লিখেছেন গত এক দশক যাবৎ সারা দেশে যে ব্যাপক নারী জাগরণ ঘটেছে তা মহাত্মা গান্ধির অবদান)। এ ছাড়াও এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে কার্ল মার্ক্স , কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টি , বিজ্ঞান

মনস্কতা, গান্ধিজি ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক , ট্রাস্টিশিপ , স্বাস্থবিধি , পরিবেশ , বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি , উত্তর আধুনিকতা ও গান্ধিজি , নাস্তিকের সঙ্গে সংলাপ , আফ্রিকাবাসীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বহির্ভারতে তাঁর প্রভাব ,ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি গান্ধিজির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা , তাঁর সম্পর্কে কবিগুরুর মূল্যায়ন , মহাত্মা গান্ধি প্রসঙ্গে নেতাজি সুভাষ প্রভৃতি বিষয় ।

গান্ধিজির সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সম্পর্কের বিষয়ে বহু অসত্য কাহিনি প্রচারিত হয়ে আসছে । কিন্তু এই সব প্রচার অসত্য ও অতিরঞ্জিত। একথা সত্য তাঁদের সঙ্গে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নে গান্ধিজির মত পার্থক্য ছিল । কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত ।গান্ধিজি ভগত সিং ও সহ বিপ্লবীদের মুক্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন একথা নেতাজি তাঁর Indian Struggle বইতে লিখেছেন। নেতাজির ভ্রাতুস্পুত্রী জামাতা হরিদাস মিত্র ও তাঁর চার সঙ্গীর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়েছিল। অভিযোগ ছিল তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর । গান্ধিজির হস্তক্ষেপে তাঁদের জীবনরক্ষা হয়। ১৯৩৯ সালে গান্ধিজির প্রচেষ্টায় সমস্ত সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা মুক্তি পান । তিনি ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে লন্ডন যাবার আগে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বক্সাদুয়ার বন্দি শিবিরে পাঠান বাংলার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য।

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে গান্ধিজির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা।গান্ধিজি মনে করতেন অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের কলঙ্ক । তিনি বলেছিলেন অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অঙ্গ হলে বিদ্রোহী হব । গান্ধিজি কেরালার আলেপ্পিতে এক জনসভায় ভাষণে বলেন ত দেশব্যাপী তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মকে শক্তিশালী করা নয় ।হিন্দুধর্ম শক্তিশালী কিংবা দুর্বল বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নির্বিকার। 'আমি শুধু বলতে চাই আমার উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতার পাপ থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করা এবং অস্পৃশ্যতার ভূত যা হিন্দুধর্মকে চরিত্রভ্রষ্ট ও বিকৃত করেছে , সেই ভূতকে বিতাড়ন করা।' গ্রন্থ লেখক তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন ' অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন সত্য ও অহিংসা আশ্রিত গান্ধিজির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কার মূলক কাজ ।স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকেও তার গুরুত্ব কম নয় , কখনও বা বেশি ।' গান্ধিজি নিজেও বলেছিলেন অস্পৃশ্যতা নিয়ে যদি দেশ স্বাধীন হয় তাহলে সে স্বাধীনতা অর্থহীন ।তিনি আন্তবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করতেন। গান্ধিজি নিজে প্রায়শ দিল্লির ভাঙ্গি কলোনিতে এসে থাকতেন। তিনি বলেছিলেন অস্পৃশ্যতা বহু মস্তক বিশিষ্ট দানবের মতন ।

বাংলায় গান্ধিজি

তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে মহাত্মা গান্ধির বঙ্গ যোগ বিষয়ে। তিনি প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন ৪ জুলাই , ১৮৯৬ সালে। তখন কলকাতায় কেউ তাঁকে চিনতেন না ।তিনি এসেছিলেন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দের সমস্যা সম্পর্কে সেখানে বলতে ।খুব সুবিধা হয়নি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেন এই বিষয়ে এখানে কেউ আগ্রহী হবেন না ।

বঙ্গবানী পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সঙ্গে কথা বলেন নি , কিন্তু খুবই রূঢ় ব্যবহার করেন । গান্ধিজি অবশ্য তাতে কিছু মনে করেন নি । আশ্চর্য্য বিষয় এই যে তিনি স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যানের কাছ থেকে প্রভুত সহায়তা পেলেন । তাঁরা গান্ধিজির সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিলেন ।যার জন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পর বর্ণ বিদ্বেষী শেতাঙ্গরা তাঁর ওপর হিংস্র আক্রমণ চালায়।

গান্ধিজি দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসেন ১৯০১ সালের ২৩ ডিসেম্বর।সেও ওই কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে । এবারও তাঁর চমকপ্রদ সব অভিজ্ঞতা হয় ।অনেক কংগ্রেস নেতার সঙ্গে পরিচয় হয়।

গান্ধিজি শান্তিনিকেতনের প্রথমবার আসেন ১৯১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেই বার তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হয়নি।কবির বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে খুব স্নেহ করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁর আশ্রমের বালকরা এখানে এসে ১৯১৪ সালে প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করে। গান্ধিজি আশ্রমে সব কাজ নিজেদের করার ওপর জোর দেন। ছাত্র শিক্ষক সবাই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করলেও এই ব্যবস্থা বেশিদিন থাকেনি। কিন্তু এই কাজ শুরু হয়েছিল ১৯১৫ সালের ১০ মার্চ। এই দিনটি শান্তিনিকেতনে এখনও ' গান্ধি পুণ্যাহ দিবস ' রূপে পালিত হয়। কবিগুরুর সঙ্গে গান্ধিজির প্রথম সাক্ষাত ১৯১৫ সালের ৬ মার্চ। শান্তিনিকেতন-এ তাঁদের চারবার সাক্ষাত হয়েছে ।

অবশ্য এই আশ্রমের বাইরেও তাঁদের সাক্ষাত হয়েছে । কবি তাঁকে ' মহাত্মা ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আর গান্ধিজি তাঁকে বলতেন ' গুরুদেব।' কবির মৃত্যুর পরেও গান্ধিজি শান্তিনিকেতন - এ একবার এসেছিলেন। গান্ধিজি বাংলায় কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় ৬৪ বার সফর করেন ও ৫৬৪ দিন রাজনৈতিক কাজে অতিবাহিত করেন।বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (তখন গুজরাত ছিল এর অন্তর্ভুক্ত)ছাড়া দেশের অন্য কোনও প্রদেশে সম্ভবত তিনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন নি ।

নোয়াখালিতে গান্ধিজির সফর

গান্ধিজির বঙ্গ প্রদেশে অবস্থানের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাঁর দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সফর। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ কোজাগরি লক্ষী পূর্ণিমার দিন রাত থেকে নোয়াখালি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম লিগ নেতা গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় ।হিন্দুরা একতরফা ভাবে আক্রান্ত হন। খুন , লুটপাট , অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ , ধর্মান্তরিত করা বাধাহীন ভাবে সবই চলতে থাকে । পুলিশ ছিল নির্বাক দর্শক। প্রথম এক সপ্তাহ বাইরের জগতে কোনও খবর আসতে দেওয়া হয়নি । বাইরের জগৎ - এ খবর আসার পর গান্ধিজি নোয়াখালির উদ্দেশে রওনা হন । তিনি কলকাতা থেকে ৬ নভেম্বর ট্রেনে রওনা হয়ে ৭ নভেম্বর চৌমহনি পৌঁছন । তিনি ১৩৭ দিন নোয়াখালি ছিলেন। তিনি বিপন্ন হিন্দুদের মধ্যে সাহস ও অপরাধী মুসলমানদের ভিতরে অনুশোচনা ও পাপবোধ সৃষ্টি করবার জন্য ওই জেলা ও পার্শ্ববর্তি ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পদযাত্রা করেন । কোথাও তাঁকে নৌকায় চাপতে হয়েছিল । তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে অনেকে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের এক এক জনকে এক একটি গ্রামে গিয়ে অবস্থান করতে পাঠান। এই ভাবে মানুষের মনে সাহস ও সদ্ভাবের মনোভাব ফিরে আসতে থাকে। তাঁর প্রার্থনা সভাগুলিতে মুসলমানরাও যোগ দিতে থাকে । মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি বিহারের উদ্দেশে যাত্রা করেন।তিনি বলে যান আবার তিনি নোয়াখালি আসবেন । এই গ্রন্থে লেখক গান্ধিজির নোয়াখালি অবস্থানের তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ উপস্থিত করেছেন ।

শেষবার বাংলায়

গান্ধিজি শেষবার বাংলায় আসেন ১৯৪৭ এর ৯ আগস্ট ।তিনি সোদপুরে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 'র পরিচালনাধীন অভয় আশ্রমে ওঠেন।তিনি নোয়াখালি যাবার পথে সোদপুরে অবস্থান করেন। দেশ আর কয়েকদিন পর স্বাধীন হবে।গান্ধিজি নোয়াখালি যাবেন। তিনি স্বাধীনতা দিবসের দিন দিল্লিতে থাকবেন না।বাংলায় থাকবেন ।বাংলা ভাগ হচ্ছে ।পশ্চিমবঙ্গ অংশের জন্য যে সরকার গঠন করা হয়েছে তার মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।তিনি গান্ধিজিকে স্বাধীনতার সময়ে কলকাতায় থাকার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন কলকাতায় পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ।অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী শহিদ সুরাবর্দি ও মুসলমানদের এক বিরাট প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এসে একই অনুরোধ করে । গান্ধিজি তাঁদের বলেন তিনি নোয়াখালি যাচ্ছেন । সেখানকার মানুষও আতঙ্কিত। মুসলিম লিগের নেতাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে সেখানে আর হিন্দুদের ওপর কোনও আক্রমণ হবে না। সুরাবর্দি ও অন্য নেতারা সেই প্রতিশ্রুতি দেন । কলকাতায় একবছর আগে ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট পাকিস্তান দাবিতে মুসলিম লিগের আহ্বানে Direct Action Day পালনের পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয় ।বহু মানুষ হতাহত হন। একবছর ধরেই উত্তেজনা চলছিল। গান্ধিজি দাঙ্গা কবলিত বেলেঘাটায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ওঠেন।তিনি সুরাবর্দিকে বলেন কোনোরকম পুলিশ পাহারা ছাড়াই তুমি আমার সঙ্গে এখানে থাকবে।হায়দারি মঞ্জিলে গান্ধিজি পৌঁছলে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু হিন্দু যুবক বিক্ষোভ দেখান। কিন্তু গান্ধিজি অবিচলিত থাকেন। পরে এরাই এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে । ১৫ আগস্ট সারা কলকাতা অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে । দীর্ঘ এক বছর কেউ কারও এলাকায় যেতো না। সেই সব বাধা উঠে গিয়েছে। গান্ধিজি খুবই প্রসন্ন হন।

কিন্তু ৩১ আগস্ট রাতে গুজব ছড়িয়ে একদল যুবক আবার দাঙ্গা বাধায় । গান্ধিজি ২ সেপ্টেম্বর থেকে মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য অনশন শুরু করেন। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে দলে দলে মানুষ বেলেঘাটায় এসে তাঁকে অনশন ভঙ্গ করবার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন।অনেক দুষ্কৃতী এসে তাদের কাছে থাকা অস্ত্র গান্ধিজির কাছে সমর্পণ করেন। এরপর গান্ধিজি ৫সেপ্টেম্বর অনশন ভঙ্গ করেন।সমবেত নেতৃবৃন্দ একটি অঙ্গীকার পত্রে সই করেন।তাতে লেখা হয় ' আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারিরা গান্ধিজির কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে , কলকাতায় আবার শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা শহরে আর কখনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হতে দেব না এবং তেমন আশঙ্কা দেখা দিলে আমৃত্যু তা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হব।' এতে সই করেন হিন্দু মহাসভার নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি ও দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি , মুসলিম লিগের শহিদ সুরাবর্দি , পাঞ্জাবি নেতা আর.কে. জইকা ,শিখ নেতা নিরঞ্জন সিং তালিব, কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ প্রমুখ।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ছিলো বাংলায় গান্ধিজির দেশ দিন । ওই দিন রাত ৯ টায় তিনি বালি থেকে ট্রেন ধরে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন । হাওড়ায় প্রবল ভিড় এড়ানোর জন্য তিনি বালি থেকে ট্রেন ধরেন।স্টেশনে তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন ড.প্রফুল্ল ঘোষ ও মন্ত্রীরা , শহিদ সুরাবর্দি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । সকলের চোখেই তখন জল।

মহাত্মা গান্ধির অমূল্য জীবন কাহিনি ও মতাদর্শ সম্পর্কে বিপুল রঞ্জন সরকার রচিত এই গ্রন্থটি এক অমূল্য সংযোজন ।

—— শান্তনু দত্ত চৌধুরী

বন্ধুতার পাতা

সংকলন : শুভেন্দু দাশগুপ্ত

[১]

মুসলমান পাড়ায় হিন্দু মাত্র ১টি পরিবার, সেই পরিবারের গুরুপদ দাস কখনসাব রোগে আক্রান্ত। দিন মজুরের ঘরে টাকা কোথায় যে রোগের চিকিৎসা হবে, হিন্দু প্রতিবেশীর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলো মুসলমান পাড়া। ঈদে উৎসবের খরচ কমিয়ে গুরুপদর চিকিৎসার জন্য স্ত্রী প্রতিমার হাতে ২৫ হাজার টাকা তুলে দিলেন তারা, পাঁশকুড়া পুর এলাকার গড়পুরুষোত্তম পুরের মল্লিক পাড়ায়। পরে আরও টাকা লাগলে আমরা দেবো — জানিয়েছেন ফিরদৌস মুলতান, গড়পুরুষোত্তম পুর স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক।

এই সময় ২৩/৩/২০২৫

[২]

গ্রামের মেলাগুলো দুটি সম্প্রদায়ের একে অপরের পাশে থাকার উদাহরণ। কোচবিহারের রাজ পরিবারের শুরু করা মদনমোহন রাসমেলায় রাসচক্র তৈরী করেন মুসলমান পরিবারের লোকজনে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪।৩।২০২৫

[৩]

পার্কসার্কাসের এস. আই. আর বিরোধিতার বন্যা রক্তের প্রতিবাদীরা অনেকেই ঈদে কাছের, দূরের জেলায় বাড়ি গিয়েছেন, তা বলে প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। চাঁদ রাতে হিন্দু সহযোগীরা অবস্থানে ছিলেন, ঈদের নমাজ শেষে এলাকার ফরিদুল, জাহিদরা তাদের জন্য ঘরোয়া সিমুই, টিকিয়া, ফিরনি নিয়ে এলেন।
ঈদের মিষ্টিমুখ অন্য মাত্রা দেয় পার্কসার্কাস ময়দানের প্রতিবাদী জমায়েতে।
আনন্দবাজার পত্রিকা
২২/৩/২৬

[৪]

নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' সিনেমায় কুম্ভকর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ফয়সল খানিক।

এই সময় ॥ ২৭॥৩॥২৬

[৫]

ভারতের জাতীয় খাবারের তালিকায় প্রথম নাম বিরিয়ানি, বিরিয়ানি বলিশ বইতে লেখক নীলাঞ্জন হাজরা একটি হিসেব দিয়েছেন - ২০২৪ সাল বিভিন্ন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ থেকে মোট ১৭ কোটি প্লেট বিরিয়ানির অর্ডার হয় গোটা দেশে ॥
আনন্দবাজার পত্রিকা ২১/৩/২৬

[৬]

'কেদার নাথ' সিনেমায় অভিনয় শুরু করে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল সারা আলি খান। সেই টানেই সারা প্রায়ই পাড়ি দেন কেদার নাথ - ৫ ///

আনন্দ বাজার পত্রিকা
১৭/৩/২৫

[৭]

গত শতকের প্রথম দিকে বাংলা থিয়েটার পাড়ায় মুসলমান শহরবাসীর ঈদ ও অন্যান্য পরবের দিনে 'বিশেষ রজনী'র আয়োজন করা হতো। একবার উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটার 'মুসলমান দর্শকগণের বিশেষ অনুরোধে' বিজ্ঞাপন দিয়ে 'কর্ণার্জুন' নাটকের আয়োজন করেছিল। প্রচুর মুসলমান দর্শক বসেছিলেন নাটকটি দেখতে। বিখ্যাত নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন — থিয়েটারের দৃশ্য পরিবর্তনের কাজে নিযুক্ত থাকতেন বেশ কিছু বাঙালী মুসলমান। তাদের বলা হতো 'সিফটার'। নাটকের কোন্ দৃশ্যের গ্রহণযোগ্যতা বুঝতে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ সিফটারদের রায়ও নিতেন। বাংলা নাটকে এদের একটা ভূমিকা ছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২৯/৩/২৫

৮

আকবর বুযর্গ
সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট।
তিনি পন্ডিত ব্যক্তি, কবি,
সাহিত্যিক, শিল্পীদের বিশেষ
সমাদর করতেন।
আকবরের সভাসদদের মধ্যে
বেশ কয়েকজন কৃতি
পুরুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে
যে নয়জন 'নবরত্ন' নামে
পরিচিত তারা হিন্দু ও মুসলমান।
রাজা বীরবল, রাজা
টোডরমল, তানসেন, আবুল
ফজল, কবি ফৈজি, আবদুর
রহিম খান, ফকির সাইফুদ্দিন,
মান সিংহ এবং মোল্লা
দো-পিয়াজা।
রাজা বীরবল আকবরের
রাজ দরবারের বিদূষক, সঙ্গীতজ্ঞ
ও কবি, তিনি সংস্কৃত,
ফার্সি এবং হিন্দি ভাষায় সুপন্ডিত
ছিলেন। রাজা টোডরমল আকবরের
অর্থমন্ত্রী, রাজা মানসিংহ আকবরের
সেনা নায়ক।
আকবর বীরবল যুক্তিবাদী, অনাবিল সিদ্ধান্ত

৯

শিল্পী ৭৫ জন, শিল্পী
সামগ্রী ১০০ এর বেশি।
মডেল ১ জন। সেই
মডেলকে দেবী দুর্গা কল্পনা
করে কখনও প্রমাতে
মহিলাদের অবস্থা, কখনও
এপান্ড পৃথিবীকে শান্তির
বাণী দিলেন শিল্পীরা।
বেলুন ফেস্টিভ্যাল ক্লাসের ছবিগুলো
ছিল শিল্প প্রদর্শনীতে
প্রধান অতিথির ভাষণে
ছিলেন রাহুলের ডক্টরেট
গবেষক ডেভেলপমেন্ট চাইল্ড
মনোবিদ দিয়ানা প্রধিকারী,
বোধন বিশ্বাসের প্রতিবা
সহ সম্পাদক তথা বিশ্বজিত,
রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক
মেলার প্রধান্যক বিশ্বপ
বৈকুন্ঠ দাস, একটি
রাষ্ট্রনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক
সেলের সম্পাদক শহিদুল
হক সিদ্দিকি।
এই সময় ২৮ মার্চ ২০২৩